হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং

সুবোধ ঘোষ
সাগরময় ঘোষ
সুশীল রায়
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গৌরকিশোর ঘোষ
রমাপদ চৌধুরী

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬০
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬০
প্রকাশক : নির্মলকুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা—৬
মুদ্রাকর : দেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস,
২১১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
আলোকচিত্র ও ব্লকের সৌজন্যস্বীকৃতি :
আনন্দবাজার পত্রিকা
স্টেটসম্যান
ব্রিটিশ লায়ন পরিবেশিত
'কনকোয়েস্ট অফ এভারেস্ট' চিত্রে
টম স্টোবার্ট গৃহীত আলোকচিত্র
ব্লক মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট
মানচিত্র
অর্ধেন্দু দত্ত
অঙ্গসজ্জা
সমীর সরকার

বোর্ড বাঁধাই ২॥০
সুলভ স্কুল সংস্করণ ১৸০

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট আরোহণের দুরূহ ও মহৎ উদ্যমে যে-সকল অভিযাত্রী প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদেরই উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হলো।

হি মা ল য়

এতদিনে গিরিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পেরেছেন পৃথিবীর দুই দুঃসাহসিক অভিযাত্রিক। কর্নেল হান্টের নেতৃত্বে চালিত ব্রিটিশ অভিযাত্রিদলের দুই দক্ষ পর্বতারোহী, ভারতের তেনজিং এবং নিউজিল্যান্ডের হিলারী, ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তারিখে এভারেস্ট-শীর্ষে উপস্থিত হ'য়ে মানুষেরই প্রায় অর্ধশত বৎসরের আকাঙ্ক্ষায় লালিত একটি পরিকল্পনাকে প্রথম সাফল্যের গৌরব দান করেছেন।

শত শত তুষারকিরীটে শোভিত ঐ হিমবান পর্বত ধরিত্রীরই এক বিচিত্র অভিব্যক্তির রহস্য ধারণ ক'রে রয়েছে। পূর্ব হ'তে পশ্চিমে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ স্থান জুড়ে হিমালয়ের কলেবর স্থাপিত। এই হিমালয়ের অন্তত এমন ছিয়াশিটি শিখর আছে যেগুলির উচ্চতা চব্বিশ হাজার ফুটেরও অধিক। ভারতীয় পুরাণ ভারতের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা করতে গিয়ে এই হিমালয়েরই নাম উল্লেখ করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেনঃ

"হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা।
তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং তস্য নামা মহাত্মনঃ॥"

উত্তরে হিমাহ্ব, তারই দক্ষিণস্থ বর্ষ হলো ভারতবর্ষ। আরো উল্লেখ আছে ঃ

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥"

সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাদ্রির দক্ষিণে অবস্থিত যে বর্ষ তারই নাম ভারত। সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকাভূমির যে মাটি ভারতীয় সভ্যতার

প্রথম আধার, সে মাটি এই হিমালয়েরই সৃষ্টি। সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্ম-পুত্রের ধারাও যে হিমালয়েরই রচনা। সুকঠিন শিলাময় হিমালয়ের যেন করুণাদ্রাবিত একটি হৃদয় আছে, তারই সরস অভিষেক লাভ ক'রে প্রাণ-প্রসবিনী শক্তি লাভ করেছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-ভূমি। হিমালয়ের এই ভূতাত্ত্বিক গুরুত্বই হয়তো ভারতীয় পৌরাণিক কল্পনাকে পিতা হিমালয় ও কন্যা গঙ্গার কাহিনী রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। সাংস্কৃতিক ভারতের চিন্তা ও কল্পনায় অনেক মহিমা ও অনেক শ্রদ্ধার আসনে অনেক দিন আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছে হিমালয়। গিরিরাজ-দুহিতা গৌরীর তপস্যার রূপ এবং উমা-মহেশ্বরের মিলনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হিমবান প্রদেশের নিসর্গকান্তিও বর্ণনা করতে ভুলে যাননি কুমারসম্ভবের কবি কালিদাস। মানসোৎসুক কলহংসের কূজন-ধ্বনি শুনে চিত্তামোদ অনুভব করেছিলেন যে কবি, তাঁর মানস-নেত্রে হিমানীসেবিত প্রদেশেরই সেই পদ্মরেণুগন্ধবাসিত হ্রদ-সলিলের শোভা ভেসে উঠেছিল। পৌরাণিক কবির কৈলাস হলো ভূতভাবন ভবানীপতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। স্বর্গ নামে কল্পিত রাজ্যটি, যেখানে পারিজাত ফোটে, দেবতারা অমৃতরস পান করেন এবং জরাহীন ও মৃত্যুহীন দেহে যৌবন অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করে, সেই স্বর্গলোকও হিমবান পর্বতের রূপরহস্য দিয়ে গড়া। দেবরাজ ইন্দ্রের অমরা আর কুবেরের অলকা আকাশলোকে অবস্থিত হলেও, তার ছায়া পড়ে হিমবানেরই বক্ষে। দেবতাদের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র রূপে কল্পিত হিমালয় শেষে ভারতীয় আধ্যাত্মিকের কাছে প্রায় একটি তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। যোগীর জন্য নির্জন নিভৃত, এবং তপস্বীর জন্য সুমহিম মৌন কন্দরে কন্দরে ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র হিমালয়। এই হিমালয় হলো বৈরাগ্যের আশ্রয়, জীব-মুক্তির নীড়। সংসারের ভোগ আর কামনার কোলাহল থেকে স'রে

গিয়ে শান্তরসাস্পদ কোন আশ্রয় যদি পেতে ইচ্ছা করে, তবে পাওয়া যাবে ঐ শুভ্র সমুন্নত হিমালয়েরই কোন নিভৃতে। হিমালয়ের নিসর্গরূপের মধ্যেই যেন এমন কিছু রয়েছে, যার প্রসাদে তত্ত্বান্বেষী আধ্যাত্মিক তাঁর অন্তরের অতি নিকটেই এক বিরাটের সান্নিধ্য সহজেই অনুভব করতে পারেন।

হিমালয়কে এই চক্ষেই দেখেছে ভারতের মানুষ। হিমালয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের চিত্তের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত প্রায় আত্মিক সম্পর্কের রূপ গ্রহণ করেছে। ইওরোপীয় মনের সঙ্গে হিমালয়ের পরিচয় অতি অল্পকাল আগের ঘটনা, তবু একথা সত্য নয় যে, ইওরোপীয়ের চিত্তে শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগ্রত করেছে হিমালয়। ইওরোপীয় অভিযাত্রিকের মনেও হিমালয় কি গভীর আত্মিক আবেদন জাগিয়ে তোলে, তার প্রমাণ হিমালয়-বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রিক ফ্র্যান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের উক্তি। হিমালয়ের শিখর সন্ধানের অভিযাত্রাকে তিনি তীর্থযাত্রা বলেই মনে করেন। হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, নৈসর্গিক, কাব্যিক ও আত্মিক তাৎপর্য সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইওরোপীয় ধারণার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকলেও হিমালয় সম্পর্কে উভয়ের আচরণের মধ্যে কিন্তু একটা মৌলিক প্রভেদ দেখা গিয়েছে। হিমালয়ের উচ্চতা জয় করার পরিকল্পনা একান্তভাবেই ইওরোপীয় আগ্রহের সৃষ্টি। ভারতবাসী হিমাদ্রির অত্যুচ্চ শিখরকে চিরকাল দূরে থেকে দেখেই তৃপ্ত হ'তে পেরেছে। ভারতীয় মন চেয়েছে, ঐ উচ্চতা অনধিগম্য হ'য়েই থাকুক। হিমালয়ের শিখরকে চিরবিস্ময়ের মন্দিরের মত অনতিক্রম্য ব্যবধান হ'তে অভ্যর্থনা নিবেদনের রীতি অনুসরণ করেছে ভারতীয়ের মন। শিখরের শীর্ষে পৌঁছবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি এবং শিখরের শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভবপর ব'লে মনেও করেনি ভারতবাসী।

হিমালয়-শিখরের শীর্ষে আরোহণে ভারতীয়ের এই অনাগ্রহের মধ্যে ইওরোপীয় সমালোচক ভারতীয় চিত্তে অ্যাডভেঞ্চারের অভাবের প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু এই অভিযোগ কি যুক্তিসম্মত? বেশী দিনের কথা নয়, ইওরোপীয়েরাও আল্পসের ষোল হাজার ফুট উচ্চ মঁ-ব্লাঁর দিকে তাকিয়ে মনে করতেন, পর্বতের ঐ তুষার-মুকুট স্পর্শ করা মানুষের সাধ্য নয়। অভিযাত্রিক দ্য সোস্যুরে যেদিন মঁ-ব্লাঁর শীর্ষে আরোহণ করলেন, তার পরেও ইওরোপীয় পর্বতারোহী দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের মনে এই ধারণা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল যে, হিমালয়েরও বাইশ হাজার ফুটের চেয়ে বেশী উচ্চ কোন চূড়ায় আরোহণ করা অসাধ্য। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর-গুলির শীর্ষে আরোহণ করার আগ্রহ এবং সঙ্কল্প বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সত্য হ'য়ে উঠেছে। এভারেস্ট আরোহণের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা ইওরোপীয়েরই সন্ধিৎসু মনে প্রথম দেখা দিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। সুতরাং পর্বতারোহণের জন্য ইওরোপীয় চিত্তে অ্যাডভেঞ্চারের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। তবে এই অভিযোগ অবশ্য করা যেতে পারে যে, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হিমালয়ের উচ্চতা জয়ের জন্য ইওরোপীয় অভিযাত্রিকের মতো উৎসাহ নিয়ে কোন ভারতীয় অভিযাত্রিককে অগ্রসর হ'তে দেখা যায়নি। কিন্তু এর কারণও ভারতীয় চিত্তে অ্যাডভেঞ্চারের অভাব নয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক পরবশতা এবং অন্যান্য কারণে যেমন অ্যাডভেঞ্চারবিহীন অনেক কর্মের ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে পিছিয়ে থাকতে হয়েছিল, তেমনি হিমালয়ের শিখরে আরোহণের মতো বহু ব্যবস্থাসাধ্য অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রেও ভারত-বাসী এগিয়ে যেতে পারেনি।

তাছাড়া, হিমালয়ের শৈলপ্রদেশের অতি দুর্গম বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ভারতীয়ের তীর্থক্ষেত্রগুলি কি ভারতীয়ের অ্যাডভেঞ্চার-

বিমুখতার প্রমাণ? দূর দুর্গমের ক্রোড়ে দেবতার বিগ্রহ স্থাপন ক'রে তীর্থযাত্রাকে ভারতীয়েরাই বরং দুরূহ অভিযাত্রায় পরিণত করেছে। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীতে গিয়ে যাঁরা উৎসের জলে স্নান ক'রে দেহশুচি ও চিত্তশুচি লাভ করেন, তাঁদের পরিভ্রমণই যে ক্লেশবহুল একটি দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। কাশ্মীরের ক্ষীর-ভবানী আর অমরনাথ, কুমায়ুনের কেদারক্ষেত্র ও বদরীক্ষেত্র, হিমগিরির তুষারের সুতীব্র শীতলতার রাজ্যে স্থাপিত এই সব ধর্মস্থান প্রমাণিত করে যে, ভারতীয়ের কাছে অ্যাডভেঞ্চার বস্তুত অবশ্যপালনীয় ধর্মাচরণের মতোই। কেদারতীর্থের আরও উত্তরে আজও রয়েছে ভারতীয় তীর্থযাত্রীর 'সত্যপথ', যেখানে পদে পদে যে-কোন মুহূর্তে ভয়াল খুনী বরফের প্রপাত নেমে আসতে পারে। সেই পথেও ত্রিশূলসম্বল ভারতীয় সন্ন্যাসী শঙ্কাবিহীন চিত্তে দেবতা দর্শনের সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে থাকেন। চারদিকে তুষারঝঞ্ঝা এবং হিমপ্রপাতের নাদতাণ্ডব, তারই মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে অবিচলিতচিত্ত হিন্দু তার জীবনদর্শনের বাণী ধ্বনিত করে—হরি ওঁ তৎসৎ! হোক ধার্মিকতার প্রেরণা, তবু অতি সাধারণ ভারতীয় হিন্দু হিমগিরির শৈলপ্রদেশের নানা দুর্গম নিভৃতে যে সহজ আগ্রহে অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হয়, তার তুলনা নেই।

'পর্বতশিখরে ফিলসফি বাস করে'—উক্তিটি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের হলেও এই উক্তির সত্যতা ভারতীয় কল্পনার ঐতিহ্যে খুব বেশী ক'রেই স্বীকৃত হয়েছে দেখতে পাই। স্কন্দ পুরাণের বৈষ্ণবখণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে, বারাহ বিষ্ণু বলছেন—'হে পৃথ্বী দেবি, সমগ্র বিশ্বকে তোমার উপর স্থাপিত করো, তোমারই সহায়তা করবার জন্য আমি পর্বত সৃষ্টি করেছি।'

পৃথ্বী দেবীও বললেন—'হে ভগবান, পর্বত আপনারই স্বরূপ।'

'অচল' অর্থ পর্বত। স্কন্দ পুরাণের শিব ও বিষ্ণু উভয়েই অচলাশ্রয়ী। বিষ্ণু বিরাজ করেন বেঙ্কটাচলে, শিব বিরাজ করেন অরুণাচলে। মহাভারতের শান্তি পর্বে এই কাহিনী আছে যে, পূর্বে মন্বন্তরপ্রভাবে পৃথিবী অত্যন্ত উন্নতাবনত হ'য়ে উঠেছিল। ভূপৃষ্ঠকে সমতল ক'রে তোলবার জন্য মহাত্মা পৃথু ধনুষ্কোটির দ্বারা শিলাজাল অপসারিত ক'রে সেই শিলাসমূহ এক এক স্থানে স্তূপীকৃত ক'রে রাখলেন। সেই সব শিলাস্তূপই হলো পর্বত।

পৌরাণিকের কল্পিত কাহিনী মাত্র, তবু দেখা যায় যে, এরই মধ্যে যেন পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু একটা ধারণা করবার চেষ্টা রয়েছে। পৃথিবীর ভৌম গঠনের আদিকালীন অধ্যায়েরই স্মারকচিহ্ন হলো পর্বত। শিলাময় কঠিন পর্বতের রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল পৃথিবীর প্রথম ভূমি। পর্বত হ'তেই নদীধারার সৃষ্টি। এবং কোটি কোটি বরষার জলে ধৌত হ'য়ে আর নিজ দেহ ক্ষয় ক'রে প্রাচীন পর্বতই পৃথিবীতে সমতলক্ষেত্র রচনা করেছে, আর উপত্যকাকে মৃত্তিকা দান করেছে। কাহিনীর মহাত্মা পৃথু তাঁর ধনুষ্কোটির সাহায্যে শিলাজাল অপসারিত করেছিলেন, এটা কাহিনী মাত্র। বিজ্ঞানী ভূতাত্ত্বিক বলেন, পৃথিবী-গ্রহের কোটি কোটি বরষা ও ঝঞ্ঝা পর্বতের কঠিন শিলাময় দেহ ক্ষয় ক'রে দিয়ে সমভূমি নির্মাণ করেছে। মহাত্মা পৃথুকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছেন কাহিনীকার, সে কাজ বাস্তবে সম্পন্ন করেছে প্রাচীন পৃথিবীর বর্ষা বায়ু রৌদ্র ও জলপ্রবাহ। 'পর্বত আপনারই স্বরূপ'—এই কথায় বিষ্ণুকে ভজনা ক'রে পৃথ্বী দেবী পর্বত সম্বন্ধে ভারতীয় মনের সেই বিশেষ সংস্কারের পরিচয়ই অভিব্যক্ত করেছেন, পর্বতকে দেবমহিমারই প্রতীক ব'লে মনে করা। মেরু মন্দর হিমবান ইত্যাদি 'অচল'গুলিকে কোন কোন পুরাণে

'অনাদিসিন্ধ' বলা হয়েছে। এই কথাটি অন্তত এইটুকু প্রমাণিত করে যে, পর্বতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় প্রায় বিজ্ঞানসম্মত ধারণাই লাভ করেছিলেন। পৃথিবী-গ্রহে প্রাণের আবির্ভাবেরও কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর তপ্ত ও গলিত বস্তুপুঞ্জের উচ্ছিত্ত যে দেহ পর্বতরূপে গঠিত হয়েছিল, তার উৎপত্তির আদি নেই বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পর্বতের আদিহেতু অনুসন্ধান করা বস্তুত সৃষ্টিতত্ত্বেরই রহস্য নির্ণয়ের চেষ্টা। প্রাচীন ভারতীয়ের মনও পর্বতের উৎপত্তি-রহস্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে গিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বেরই সন্ধান লাভ করেছে। অথর্ববেদের পৃথ্বী সূক্তে এই উপলব্ধিরই পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে এবং তার মধ্যে হিমবন্তেরও উল্লেখ দেখা যায়। 'গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোহরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু'। —হে পৃথিবী, তোমার গিরি পর্বত হিমবন্ত ও অরণ্য আমাদের আনন্দ দান করুক। ভূমিরও এক চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বৈদিক ভারতের জ্ঞানী এবং তারই স্বীকৃতির সঙ্গীত এই পৃথ্বী সূক্ত। জড়বস্তুরই বিভিন্ন ভৌগোলিক বিগ্রহের মতো এই পর্বত শিলা ও ভূমির বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভারতীয়ের দার্শনিক সন্ধিৎসা শেষ পর্যন্ত এক চিন্ময়েরই অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। পর্বতশিখরে ফিলসফি বাস করে—পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের চিন্তায় যে-তত্ত্ব একটি প্রত্যয় মাত্র, ভারতীয় ধার্মিকের চিন্তায় ও আচরণে সে-তত্ত্ব সহজ সংস্কারেই পরিণত হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা কেদারতীর্থে গিয়ে ভারতীয় হিন্দুর পর্বতপ্রিয়তারই এক ধর্মীয় রূপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, আগন্তুক যাত্রীর দল এই যে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে দুই হাতে কেদারেশ্বর শিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরছে, এই অনুষ্ঠান হলো পর্বতশিখরকেই হৃদয়ের সমগ্র আগ্রহ দিয়ে বক্ষঃলগ্ন করার এবং আপন ক'রে নেবার

অনুষ্ঠান। তীর্থযাত্রীর প্রণামের ভঙ্গী দেখে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার মনে হয়েছিল, সারা ভারত হিমবন্তের পায়ে প্রণাম নিবেদন করছে।

এই হলো ভারতের হিমবন্ত, যার মহিমা বিংশ শতাব্দীর ভারতকবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নতুন ভাষায় নতুন অভ্যর্থনা লাভ করেছে। হিমাচল হলো—'ভারতের অনন্ত-সঞ্চিত তপস্যার মতো'। কবির চক্ষে ধরা পড়েছে, এক মহা বিরাটের প্রতীকের মতো ঐ হিমাচলে 'স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত।' আধ্যাত্মিক ভারত তার ঐ হিমালয়ের রূপের মধ্যে ভাগবত তত্ত্বেরই রূপ দেখতে পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয়ের কাব্য-সাহিত্যে হিমালয় খুব বেশী কিছু স্তুতিলাভ করেনি। হিমালয়ের চেয়ে হিমালয়ের দান গঙ্গা ও যমুনা নামে দু'টি নদীকেই স্তোত্রে ও স্তবে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাচীন ভারতের কবিকুল। এর প্রধান হেতু সম্ভবত এই যে, গঙ্গা-যমুনারই উপত্যকা-প্রদেশের অধিবাসীর চিত্তক্ষেত্র হ'তে ভারতীয় কাব্যসাহিত্য প্রধানত উদ্ভূত হয়েছে। হিমাচলের শৈলপ্রদেশ যদি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম আধারভূমি হতো, তবে অবশ্যই হিমালয়ের বন্দনাগানে মুখরিত হ'য়ে উঠত প্রাচীন ভারতীয়ের সাহিত্য। কিন্তু গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির জন্মভূমি। লক্ষ্য করবার বিষয়, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র যদিও হিমালয়েরই করুণার প্রবাহ, তবু প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যে এই দু'টি নদের মহিমা উপেক্ষিত হয়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য যে নর্মদার উদ্দেশ্যে শ্লোকাষ্টক নিবেদন করেছেন, সে নর্মদা গাঙ্গেয় উপত্যকারই শেষ দক্ষিণের পর্বতনিঃসৃত প্রবাহ। রামায়ণও হিমালয়ের মহিমা সম্বন্ধে নীরব।

"মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।"

মহাকবি বাল্মীকি যে ভাগীরথীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন, সেই ভাগীরথীর পরিচয় দিতে গিয়ে হিমালয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কোন কথা তিনি বলেননি। 'হিমগিরিদুহিতা উমার সপত্নী' ভাগীরথীর বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। শ্রীশঙ্করাচার্যও 'শৈলেন্দ্রাদবতারিনী' পুণ্যতোয়া গঙ্গার বন্দনা করেছেন, কিন্তু শৈলেন্দ্রের বন্দনা করেননি। হিমালয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রশস্তি নেই।

তবে প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যে এবং ধর্মীয় স্তবসাহিত্যে হিমালয়ের মহিমা সম্বন্ধে স্বীকৃতির ভূরি উল্লেখ না থাকলেও, ভারতীয় চিন্তা ও আচরণের বাস্তব ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে কোন আক্ষেপ আর থাকে না। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী বলেন, গঙ্গাসলিল হিমালয়ের প্রভাবেই আয়ু কান্তি এবং আরোগ্য প্রদায়িনী শক্তি লাভ করেছে। চরকের উক্তি অনুযায়ী গঙ্গাসলিল হলো, 'হিমবৎপ্রভাবা পথ্যা'। চক্রপাণি দত্ত বলেন—'যথোক্ত লক্ষণ হিমালয় ভবত্বাদেব গাঙ্গং পথ্যম্'। বাগভট্ট জানিয়েছেন— 'হিমবন্মলয়োদ্ভূতাঃ পথ্যাস্তা এব চ স্থিরাঃ'। ব্রহ্মার কমণ্ডলু, মুরারিচরণ এবং হরজটার স্পর্শে পুণ্যসলিলা হয়েছেন কবি-কল্পনার গঙ্গা। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী বাস্তব সত্যের ঘোষণা করতে ভুলে যাননি, হিমালয়ের প্রভাবেই যথার্থ সুসলিলা হয়েছেন গঙ্গা, গঙ্গাসলিল হয়েছে 'পথ্য'।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হিমালয়েরই শৈলপ্রদেশ ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর অজস্র ঘটনা এবং দেবতাতত্ত্বের আধার-ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ধার্মিক কবির স্তোত্রে বন্দিত না হয়েও হিমালয় ভারতের সাংস্কৃতিক কল্পনা ভাবনা ও উপলব্ধির স্মৃতি নিজের বক্ষে ধারণ করবার গৌরব লাভ করেছে। পুরাণে ও কাব্যে হিমালয় যেটুকু উপেক্ষিত হয়েছে, সেটুকু ভাল ক'রেই সম্মান ও সমাদরে পুষিয়ে দিয়েছে লোকপ্রবাদ। ব্যাসদেব যেখানে ব'সে

মহাভারত রচনা করেছিলেন, মার্কণ্ডেয় যেখানে তপস্যা করেছিলেন, অগস্ত্য যেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্র শোষণ করেছিলেন. পৌরাণিক কিংবদন্তীর সেই সব ঘটনাস্থল আজ হিমালয়ের শৈলপ্রদেশের শিলা নির্ঝর ও গুহার আশে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। পাণ্ডবেরা যেখানে স্নান করেছিলেন এবং ধ্রুব যেখানে পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, সেই পাণ্ডবঘাট ও ধ্রুবঘাট হিমালয়ের শৈলপ্রদেশেরই দুটি স্থান। কমলেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন রাম এখানেই। যে স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্মীর গলায় মাল্যদান করেছিলেন নারায়ণ, আর কুপিত হ'য়ে নারদ নারায়ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই স্থান মন্দিরে চিহ্নিত হ'য়ে হিমালয়েরই শৈলপ্রদেশে এক পথের পাশে রয়েছে। পৌরাণিক ভারতের অজস্র কাহিনী গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে হিমালয়েরই বক্ষে। শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব, এমনকি বৌদ্ধও, এই হিমালয়ের ক্রোড়ে তার আরাধ্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে। আছে রামসীতার মন্দির, আছে নরসিংহ ও নবমাতৃকার বিগ্রহ। আছে গৌরীকুণ্ড। আছেন সত্যনারায়ণ, গোপেশ্বর শিব এবং বিষ্ণু বদরীবিশাল। আছে রাজা মরুত্তের যজ্ঞস্থলী। এখানে উষ্ণপ্রস্রবণের জলে ভস্মাসুরের অস্থিচূর্ণ উৎসারিত হয়। হরগৌরীর বিবাহের দিনে যজ্ঞস্থলে যে আগুন জ্বলেছিল, সেই আগুন আজও জ্বলছে ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরের নিভৃতে। কিরাতার্জুনের পদচিহ্ন ধারণ ক'রে রয়েছে ভীলকেদারের শিলা। মহাপ্রস্থানের পথে 'লক্ষ্মীবন' স্মরণ করিয়ে দেয়, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী এখানেই ভূমিতে লুটিয়ে প'ড়ে শেষ নিঃশ্বাস বর্জন করেছিলেন।

হিমালয়ের শৈলপ্রদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়নি। কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সকল নিদর্শনের ছাপ হিমালয়ের বুকে অঙ্কিত করার রীতি কালক্রমে ভারতীয় ধর্মা-

চরণেরই একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। ভারতের যে কোন প্রান্তে যে কোন ধর্মীয় ভাবনাই উদ্ভূত হোক না কেন, তার কিছু না কিছু স্মৃতিচিহ্ন হিমালয়ের নিভৃতে কোথাও না কোথাও স্থাপিত না ক'রে পারেননি ভারতীয় ধর্মপ্রচারক। হিমালয়ের বক্ষে একত্রিত হয়েছে ভারতের ধর্মীয় চিন্তারীতির সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। হিমালয় ভারতীয় ঐক্যভাবনার ধারক।

ভূতাত্ত্বিক বলেন, আজ হিমাচল যে-স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে একদিন ছিল সমুদ্র। অতি অতীতের সেই সমুদ্রকে আজকের ভূতাত্ত্বিক একটা নামও দিয়েছেন, টেথিস সমুদ্র। আজকের ভূমধ্য-সাগর পুরাকালের সেই টেথিসেরই অবশেষ। এই টেথিস সমুদ্রেরই তলস্থলের উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছিল পদার্থের পঙ্ক। কালের এক বিপুল অধ্যায় এইভাবেই পার হ'য়ে গিয়েছে। ভূতাত্ত্বিকেরা যে যুগকে বলেন টার্সিয়ারী তথা তৃতীয়ক, অর্থাৎ পৃথিবীর ভৌম সংগঠনের তৃতীয় পর্যায় যে কালে সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই কালেরই মধ্য অধ্যায়ে টেথিস সমুদ্রের তলদেশের বহিরাবরক ভূস্তরে এক অভ্যুত্থানের চাঞ্চল্য দেখা দিল। পাঁচ কোটি বৎসর পূর্বে টেথিস সমুদ্রের তলদেশে ভূস্তরের এই অভ্যুত্থানের আবেগই হলো আজকের তুষারমৌলি হিমালয়ের উৎপত্তির শুরু। দুই কোটি বৎসর ধ'রে টেথিসের তলদেশ হ'তে তরঙ্গাকারে পরপর সমান্তরাল-ভাবে বিন্যস্ত এবং কঠিনীকৃত পদার্থপঙ্কের স্তরভার ক্রমেই উন্নত হয়েছে এবং আজকের হিমালয়রূপে পরিণাম লাভ করেছে।

ভূ-প্রকৃতির গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্তমান ভারতের তিনটি পৃথক এবং প্রধান অঞ্চল লক্ষ্য করা যায়। হিমালয় অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য এবং সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার সমভূমি। দাক্ষিণাত্যের দেহ হিমালয়ের তুলনায় বয়সে অনেক প্রাচীন। দাক্ষিণাত্যের পর্বত হলো শিষ্ট-পর্বত, হিমালয় পর্বতের মত মৃত্তিকার অভ্যুত্থানের সৃষ্টি নয়।

দাক্ষিণাত্যের শিলা হলো পিণ্ডাকৃতি আগ্নেয়শিলা এবং এই শিলা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রচণ্ড লাভা-প্রবাহে একদিন প্লাবিত হয়েছিল এই ভূমি। কোটি কোটি বরষার জলধারা পুরাকালীন দাক্ষিণাত্যের শিলাময় ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে-মুছে ক্ষয় করার সময় যেন মাঝে মাঝে ছাড় রেখে গিয়েছিল। সেই ছাড়গুলিই হলো দাক্ষিণাত্যের পর্বত ও গিরিশ্রেণী। চেপ্টামাথা দক্ষিণী পর্বত, 'শিখর' নামে কোন সম্পদ তার নেই।

আর হিমালয় যেন শিখরশোভারই অধীশ্বর। আর এক বিস্ময় এই যে, হিমালয়েরই সাধারণ কলেবর আর অত্যুচ্চ শিখরসমূহের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, শৈলগোত্রের পার্থক্য। হিমালয়ের সাধারণ কলেবর সেই টেথিস সমুদ্রেরই তলদেশে থিতিয়ে-পড়া ও স্তরীভূত পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত। অতি প্রাচীন সামুদ্র শঙ্খ, শুক্তি ও কীটের অশ্মীভূত অবশেষ হিমালয়ের শিলাময় পঞ্জরের স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, হিমালয় বৃদ্ধ নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবেরও কয়েক কোটি বৎসর পরে হিমালয় জন্মলাভ করেছে। বয়সে দাক্ষিণাত্যের গিরিশ্রেণীর তুলনায় হিমালয় অনেক নবীন। কিন্তু হিমকূটের অত্যুচ্চ মুকুট-গুলি গ্রানিটে গঠিত, পৃথিবীর প্রবীণতম শিলা আর্কীয় যুগের গ্রানিট, প্রাণের আবির্ভাবেরও বহুপূর্ব কালের এবং পৃথিবীর প্রথমজা শিলা সেই গ্রানিট। হিমালয়ের সুবিস্তৃত পাললিক শিলার স্তরসজ্জার স্থানে স্থানে গাঠনিক দুর্বলতা ছিল। এই দুর্বল ও অদৃঢ়বিন্যস্ত স্তরসমূহকে দীর্ণ ক'রে ভূপঞ্জরের নিম্নলোক হ'তে উপরে উৎসারিত হলো সুপ্রচুর গ্রানিটপুঞ্জ। বিভিন্ন স্থানে উৎসারিত এই গ্রানিটই হলো হিমালয়ের বিভিন্ন অত্যুচ্চ শিখর। শিখর এভারেস্টের শরীরও এই প্রাক্-প্রাণ যুগের শিলাপিণ্ড গ্রানিটেই গঠিত।

সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার সমভূমি হিমালয়েরই সৃষ্টি। আগ্নেয়-শিলার দাক্ষিণাত্য এবং উত্তরের হিমালয়ের মাঝখানে পরিখার মত ছিল সুবিস্তীর্ণ এক গহ্বরদেশ। হিমালয়ের দেহ হতে পলল ও শিলারেণু লক্ষ জলপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হ'য়ে সেই সুবিস্তীর্ণ গহ্বরদেশের শূন্যোদরও একদিন ভরাট ক'রে দিল। রচিত হলো সিন্ধু-গঙ্গার মৃত্তিকাময় সমভূমি।

আজকের জ্ঞানী মানুষ পাষাণকায় হিমালয়ের ঐ তুষারলিপ্ত উচ্চতার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। তিন কোটি বৎসরেরও আগে ভূ-প্রকৃতি তাঁর বিচিত্র-বিপুল আত্মপ্রকাশের যে আবেগে বস্তুপুঞ্জ উৎসারিত করেছিলেন, সেই আবেগই যেন স্তব্ধীভূত হ'য়ে রয়েছে হিমালয়ের শিখরে। কখনও বা মনে হয় উচ্চতম শিখর ঐ এভারেস্ট যেন পার্থিব শুভ্রতার উপহার ঊর্ধ্বাকাশের বক্ষে ডালি দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এ হেন শিখর এভারেস্টেরই স্পর্শ লাভ ক'রে ফিরে এসেছেন দুই অভিযাত্রী। ভূপৃষ্ঠের তুঙ্গস্থানে উপনীত হবার এই কৃতিত্ব নিতান্তই ঊনত্রিশ হাজার ফুট ভৌম উচ্চতা জয় করার ঘটনা নয়। বরং বলা যায়, এই ঘটনা হলো মানুষেরই ক্ষান্তিহীন জিজ্ঞাসার ও কৌতূহলের এক সার্থক উপনয়ন। ধরণীর এক উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশের কতগুলি বরফ আর পাথরের কাছে নয়, বিরাট এক জ্ঞাতব্যের কাছে, দুরধিগম্য এক তত্ত্বের কাছে এতদিনে পৌঁছতে পেরেছে জিজ্ঞাসু মানুষজাতির দুই প্রতিনিধি।

কোন কোন সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে—'ফল অব এভারেস্ট'। অর্থাৎ এভারেস্টের 'পতন' হয়েছে। কিন্তু এভারেস্ট এভারেস্টই আছে, তার অত্যুচ্চতার বিন্দুমাত্র ক্ষয় কিংবা হানি হয়নি। সমুন্নত এভারেস্টের সুকঠিন গৌরব ধুলো হয়ে ঝরে পড়ুক, আর উপত্যকার সমভূমির সঙ্গে একাকার হ'য়ে যাক, মূর্তিহন্তার মত এরকম কোন আক্রমণের বাসনা ছিল না কোন অভিযাত্রীর মনে। এই অভিযাত্রা

মানুষী দম্ভের অধিরোহণ পর্ব নয়; মহত্তর পরিণাম লাভের জন্য মানুষেরই চিরকালীন অভিলাষের এক দুরূহ অন্বেষণার পর্ব। উপরে উঠতে চায় মানুষ, উপরকে নিচু করে দেবার জন্য নয়, উপরের সঙ্গে নৈকট্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। বলতে পারি, এভারেস্টের শৃঙ্গে পৌঁছবার শেষ বাধাগুলিকে এতদিনে, এইবার এবং এই প্রথম জয় করতে পেরেছেন দুই অভিযাত্রী। বহু অভিযাত্রীর প্রাণোৎসর্গ গ্রহণ করেছে হিমালয়ের তুষার। কে জানে, বিপুল গ্রানিটের কোন্ অলক্ষ্য ক্রোড়ে তুষারাবৃত স্ফটিকের মত ঘুমিয়ে আছে সেই সব শঙ্কাহীন সন্ধিৎসুর অস্থি। আজকের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী আগ্রহের, পরিকল্পনার ও প্রচেষ্টার ইতিহাস। এবং এর মূলে নিহিত রয়েছে মানুষেরই চিত্ত-প্রকৃতির সেই প্রেরণা, যে প্রেরণা মানুষকে তার পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তরের সঙ্গ লাভের জন্য উদ্বোধিত করে। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় মানুষ। অজানিতকে জানবার এবং আপন ক'রে নেবার এই আগ্রহ ও অধ্যবসায়ই প্রমাণিত করে যে, মানুষ নিছক প্রাণী নয়। প্রাণিত্বের অতিরিক্ত একটি আত্মিক সত্তা আছে মানুষের। মানুষেরই মধ্যে 'দেবোপম' কিছু নিহিত রয়েছে, যার প্রেরণায় সে লাভ ক'রেছে শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসার অ্যাডভেঞ্চার। শুধু জৈব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নয়, শুধু ঔদরিক আগ্রহের তাড়নায় নয়, জীবনের আত্মিক প্রতিষ্ঠার জন্যও মানুষ প্রাণপাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। তার দৃষ্টান্ত এভারেস্ট অভিযাত্রা। তাই এভারেস্ট আরোহণের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের একটি বৃহত্তর তাৎপর্য আছে। বিশ্বপ্রকৃতির রূপ মর্ম রহস্য ও তত্ত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পথে মানুষ নিজেকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

শিখর এভারেস্ট, যেখানে চিরনীহারের শীতলতার মধ্যে ধ্যানস্থ হ'য়ে রয়েছে ধরিত্রীরই তপ্ত বক্ষ হ'তে উৎক্ষিপ্ত জড়, সেই শিখর

তিন কোটি বৎসরের মধ্যে এই প্রথম দুটি আগন্তুক প্রাণের স্পর্শ লাভ করলো। কোটি তুষার-ঝটিকার আক্রোশ এবং হিমপ্রপাতের আর্তনাদ শুনেছে এভারেস্ট; কিন্তু প্রাণের ধ্বনি, মানুষের মুখ হতে উচ্চারিত ভাষা শুনতে পেল এই প্রথম।

হিমালয়ের ক্রোড়দেশে কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আতিথ্য লাভ ক'রে আসছে প্রাণ। বড় বিচিত্র হিমালয়লালিত প্রাণ এবং তার ইতিহাসও বিচিত্র। হিমালয়েরই শাখা ঐ শিবালিক গিরিমালার ভূস্তরে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর লুপ্তাবশেষ সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে। শিবালিকের ভূস্তরে সমাহিত অস্থি ও কঙ্কাল স্মরণ করিয়ে দেয়, কলেবর-গৌরবে কত বিচিত্র আর বৃহৎ ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সেই সব স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ। নরাকার দ্বিপদের করোটিও এই শিবালিকের প্রাগৈতিহাসিক শ্মশানে পাথরের অন্তরাল হ'তে উদ্ধারিত হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন, শিবালিকের এই অতিপ্রাচীন নরাকার দ্বিপদ জীবগোষ্ঠীর দৈহিক গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে আধুনিকতম মানবেরই দৈহিক গঠনের পূর্বাভাস ও পারম্পর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমবিবর্তনের সুদীর্ঘ অধ্যায় পার হবার পর সেই দ্বিপদের দেহ মানবদেহরূপে যে সুপরিণত গঠন লাভ করেছিল, তারও নিদর্শন হয়তো শিলীভূত কঙ্কাল হ'য়ে ঐ শিবালিকেরই ভূস্তরের কোন নিভৃতে লুকিয়ে রয়েছে। বৈজ্ঞানিকের এই অনুমান যদি কোনদিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে আর এক বিস্ময়কর সত্য ঘোষণা করতে পারা যাবে যে, পৃথিবীর প্রথম মানব আবির্ভূত হয়েছিল এই হিমালয়েরই ক্রোড়ে।

যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার কথা থাক। যা আছে, তার বৈচিত্র্যই যে বিস্ময়কর! কাশ্মীর হতে আসামের উত্তরভাগ পর্যন্ত, হিমগিরির ক্রোড়ধৃত শৈলপ্রদেশে উদ্ভিদ আর জীব যেন বৈচিত্র্যেরই উৎসব জাগিয়ে রেখেছে। হাজার রকম অর্কিডের পুষ্পে পুষ্পে

রঙের বিচিত্র সমারোহ। স্তবকিত বর্ণের শোভা দীপ্ত ক'রে ফুটে ওঠে হিমালয়ের রডোডেনড্রন। হিমালয়ের প্রজাপতিও যেন উড়ন্ত অর্কিড পুষ্প, তার বর্ণবৈচিত্র্যের অন্ত নেই এবং তার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংখ্যাও সহস্রাধিক। হিমালয়ের বিশাল-ঋজু দেবদারুই হলো প্রকৃত বনস্পতি। হিমালয়ের চির চেনার পাইন শাল ও ফার্নের অরণ্য প্রাণেরই আত্মপ্রকাশের এবং প্রতিষ্ঠার পুলক যুগ যুগ ধ'রে ধারণ ক'রে রয়েছে। জীবনের প্রকৃতি এখানে তীব্র এবং কঠোর, কিন্তু তার রূপ বিচিত্র। অরণ্য-সুরভির আঘ্রাণ লাভের জন্য, আর জ্যোৎস্নালিপ্ত তুষার চুম্বন করার জন্য ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায় এই হিমালয়েরই মৃগ—কস্তুরী আর চমরী।

জড় ও প্রাণের এমন বৈচিত্র্য আধারীভূত হ'য়ে রয়েছে যে হিমবন্তের কলেবরে, তারই উচ্চতম শিখরের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আরও অন্তরঙ্গ হবে, অভিযাত্রার সাফল্য ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনাকেই নিকটতর করেছে। কবি কালিদাসের 'দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ'এর সর্বোচ্চ মুকুট, পৃথিবীর উচ্চতম শিখর এভারেস্ট হলো বিরাটের প্রতীক। বিরাট ও গম্ভীর, অথচ প্রসন্ন ও সুন্দর। অনেকেই অনুমান করেন, হিমালয়েরই সমুন্নত শিখরের রূপাভাস অবলম্বন ক'রে ভারতীয় শিল্পী যোগমগ্ন শিব এবং ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি পরিকল্পনা করেছিলেন।

শিল্পী হোক, বিজ্ঞানী হোক, আর আধ্যাত্মিক হোক, এভারেস্ট অভিযাত্রার সাফল্যের সংবাদ শুনে পৃথিবীর প্রত্যেক সন্ধিৎসুর মনে এই ধারণাই দেখা দেবে যে, এতদিনে এমন এক তীর্থের পথ চিনে নেবার পালা শেষ হলো, যেখানে নতুন রূপ আছে, আনন্দ আছে, তত্ত্ব আছে।

রাধানাথ শিকদার

ছেলেবেলা থেকেই আমরা ভূগোলে পড়ে আসছি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ কোথায়।

—হিমালয়ে।

—কী তার নাম?

—মাউণ্ট এভারেস্ট।

—কত ফুট উঁচু?

—উনত্রিশ হাজার দুই ফুট।

—গিরিশৃঙ্গের এই উচ্চতা কে আবিষ্কার করেছিলেন?

—রাধানাথ শিকদার।

এক শতাব্দী আগে বাঙলা দেশের এই কৃতী সন্তান এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণ না ক'রেও তার উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গৌরবটুকু যে ভারতবাসীরই প্রাপ্য এই সত্যটি আজ একশ' বছর ধ'রে ব্রিটিশ জাতি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার কত চেষ্টাই না ক'রে এসেছেন। তাঁরা নানাভাবে এতদিন ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ের কৃতিত্ব কোনো ভারতবাসীর নয়, সে-কৃতিত্ব ইংরেজের। কিন্তু এক ইংরেজেরই লিখিত নথিপত্রে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে যে, এ-গৌরব একজন ভারতবাসীরই প্রাপ্য। মেজর কেনেথ সেসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক এবং একজন বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক। তিনি এক সময়ে বেশ কিছুদিন ভারতীয় সার্ভে অর্থাৎ সমীক্ষা বিভাগে কাজ ক'রে গিয়েছেন। ১৯২৮ সালে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিমালয়ান রোম্যান্সেস' নামক প্রবন্ধে এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার ও তার নামকরণ সম্পর্কে তিনি

যা লিখে গিয়েছেন, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা-আবিষ্কারক একজন বাঙালী। তিনি লিখেছেন:

"হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভূমি সমীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় ১৮৫২ সালের এক সকালে একজন বাবু স্যার জর্জ এভারেস্টের স্থলাভিসিক্ত স্যার এণ্ড্রু অ-র ঘরে ছুটে গিয়ে বলেছিলেন 'স্যার, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ আমি আবিষ্কার করেছি।' সুদূর পর্বতাঞ্চলে যখন পর্যবেক্ষণের কাজ চলছিল, তখন ইনিও সেই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এণ্ড্রু অ এই গিরিশৃঙ্গের নামকরণ করেন মাউণ্ট এভারেস্ট। তিব্বতী বা নেপালী ভাষায় এই শৃঙ্গের কোনও স্থানীয় নাম তখন পাওয়া যায়নি।"

১৯২৮ সালে লেখা প্রবন্ধে যে-কথা বলা হয়েছে ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বারার্ড ও হেডেন কর্তৃক লিখিত 'দি ডিসকভারি অব্ মাউণ্ট এভারেস্ট' অধ্যায়ে সে-কথাই চাপা দিয়ে সত্যের বিকৃতি আরম্ভ হয়। তাঁরা লিখলেন যে, এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব সমীক্ষা বিভাগের কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়। নেহাৎই করুণা ক'রে তাঁরা নাকি এটুকু লিখেছিলেন যে, এই আবিষ্কারে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার একজন। আর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ডব্লু এইচ মারের 'স্টোরি অব্ এভারেস্ট' গ্রন্থে বলা হয়েছে এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ের কৃতিত্ব হেনেসি নামক এক সার্ভে-সহকারীর প্রাপ্য, শিকদারের নয়। কারণ শিকদার নাকি তখন দেরাদুনেই ছিলেন না, ছিলেন কলকাতায় সার্ভেয়র জেনারেলের অফিসে।

এইবারের এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণের সংবাদ পরিবেশনে ইংরেজদের সত্যকে বিকৃত ক'রে সব গৌরবটুকু আত্মসাৎ করার অপকৌশল অত্যন্ত নির্লজ্জভাবেই ধরা পড়েছে। কলকাতায় ইংরেজদের একমাত্র মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বিরাট শিরোনামা

দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলেন—'ব্রিটিশ পর্বতারোহীরা এভারেস্ট জয় করলেন'।• অথচ যে-দুজন এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করলেন, তাঁদের দুজনের একজনও ব্রিটিশ নন, প্রথমজন তো ননই। ব্রিটিশ ব্রড-কাস্টিং কর্পোরেশন লণ্ডন থেকে সংবাদটি বেতারে ঘোষণা করলেন এই বলে যে, কর্নেল হাণ্টের নেতৃত্বাধীনে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের এডমাণ্ড্ হিলারী একজন পোর্টার নিয়ে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন। ভারতীয় পর্বতারোহী তেনজিং নোরকে, যিনি সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করলেন, তাঁর নামটুকু পর্যন্ত উল্লেখের প্রয়োজন ত বোধ করলেনই না, উপরন্তু তাঁরা তেনজিংকে 'কুলি' আখ্যা দিয়ে প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টাই করলেন।

স্বাধীন ভারতে এভারেস্ট বিজয়ের এই সাম্প্রতিক ঘটনার উপর ইংরেজদের প্রচার কৌশল যেভাবে কাজ করেছে, সেখানে এক শতাব্দী আগের পরাধীন ভারতের আরেক ঘটনাকে ইতিহাসের পাতা থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলার জন্যে যে কত বেশী চাতুর্য তাঁরা দেখাতে পারতেন, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। স্বাধীন ভারতের পর্বতারোহী তেনজিং নোরকের নাম যেখানে ব্রিটিশ বেতার সসম্মানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি, সেখানে 'নেটিভ' রাধানাথ শিকদারের নাম তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দ্বারা উল্লিখিত না হওয়াটাও আশ্চর্যের কিছুই নয়।

কিন্তু মিথ্যা প্রচার কি চিরকাল সত্যকে চেপে রাখতে পারে? পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্ব। রাধানাথের জীবনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, বাংলার এই কৃতী সন্তান তীক্ষ্ণ মেধা ও আপন শক্তিমত্তার জোরেই গৌরবের উচ্চাসনে নিজেকে ও নিজের

দেশকে বসিয়ে গিয়েছেন। শতবর্ষের চেষ্টাতেও সেই উচ্চাসন থেকে তাঁকে নামানো যায়নি, যাবে না।

রাধানাথ শিকদার ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায়। পিতা তিতুরাম ছিলেন সে সময়কার একজন উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিতুরামের দুই ছেলে রাধানাথ ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথও রাধানাথের মতই অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সমীক্ষা বিভাগে চাকরিতে বিশেষ উন্নতিলাভ করেন।

ছেলেবেলায় বাড়িতে পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন শেষ ক'রে ৪৮নং চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে ভর্তি হন তিনি। পরে ১৮২৪ সাল থেকে সাত বছর তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন। ডিরোজিওর কাছে ইংরেজী অধ্যয়ন কালেই রাধানাথের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। মেধাবী ছাত্র তো তিনি ছিলেনই, দৃঢ়তাও ছিল অতুলনীয়। একটার পর একটা পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'য়ে হিন্দু কলেজের অধ্যয়নের শেষ তিন বছর তিনি রস ও টাইটলার সাহেবের কাছে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রথম ভাগ অধ্যয়ন করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধানাথই এই দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম ছাত্র। এই সময় থেকেই অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁর ঝোঁক দেখা দেয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। অধ্যয়নকালে তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৮৩১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর 'গভর্ন-মেণ্ট গেজেট'-এ তার উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। রাধানাথ ডেভিড হেয়ারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সতীর্থদের সঙ্গে তিনিও ডেভিড হেয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে হিন্দু কলেজে অধ্যায়নকালে কলকাতায়

অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাধানাথের ছাত্র-জীবনের কথার বহু উল্লেখ তাঁর সতীর্থ রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির লিখিত আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রাধানাথ শিকদার একখানি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ ১২৯১ সনের আশ্বিন, কার্তিক ও মাঘ সংখ্যা 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদি আত্মস্মৃতির শেষাংশ কেউ সেদিন সযত্নে রেখে দিয়ে যেতেন, তবে আজ তার সাহায্যে অনেকের কৌতূহল যেমন মিটত, তেমনি নতুন তথ্যও উদ্ঘাটিত হ'ত। সম্পূর্ণ আত্মজীবনী তো কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং তার পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করা যায়নি। 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত আত্মকথার প্রথমাংশে তাঁর ঘটনাবহুল কর্মজীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, কর্নেল জর্জ এভারেস্ট হিন্দু কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টাইটলারের কাছে গণিতশাস্ত্রে মেধাবী তাঁর কোনো ছাত্রকে 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র দপ্তরে কাজ করবার জন্য চেয়ে পাঠান। ডঃ টাইটলার রাধানাথ শিকদারকেই এ-কাজের উপযুক্ত মনে ক'রে এক প্রশস্তিপূর্ণ চিঠি দিয়ে জর্জ এভারেস্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভারেস্ট পত্রপাঠ তাঁকে কাজে নিযুক্ত করলেন। এ হলো ১৮৩২ সালের ঘটনা।

স্যার জর্জ এভারেস্ট (১৭৯০—১৮৬৬) ছিলেন গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কৃতী বিজ্ঞানী। তিনি ১৮২৩ সালে 'ট্রিগোনো-মেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। আপন কৃতিত্বের জোরে তিনি ১৮৩০ সালে সার্ভেয়র জেনারেলের পদে উন্নীত হলেন এবং ১৮৪৩ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এভারেস্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে সমীক্ষার কাজের

সূবিধার জন্য 'এক্স-রে' পদ্ধতি নামক বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার। তাঁর এই আবিষ্কারের পরে সমীক্ষা পদ্ধতির অনেক সংস্কার হ'লেও আজও ভারতের সমীক্ষা বিভাগ এভারেস্ট-আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসরণেই কাজ ক'রে আসছেন।

জর্জ এভারেস্ট তাঁর আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতি নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করবার জন্য গণিত শাস্ত্রে মেধাবী অথচ কর্মঠ ও উদ্যমশীল একজন যুবককে খুঁজছিলেন। যাঁকে খুঁজছিলেন, তাঁকে পেয়ে গেলেন। রাধানাথকে তিনি সমীক্ষা বিভাগের কাজে নিযুক্ত ক'রেই হিমালয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। রাধানাথ ১৮৩২ সালে তাঁর আত্মকথায় লেখেন—"আমি এক্ষণে সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া সেরোং বেস লাইনে কার্য করার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।"

অর্থাৎ ত্রিকোনমিতিক সমীক্ষায় ভারতবাসীর মধ্যে রাধানাথই সর্বপ্রথম সমীক্ষা বিভাগের কাজে নিযুক্ত হন।

রাধানাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ 'ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে'র কাজেই অতিবাহিত হয়। সুতরাং তাঁর পরিচয় ভালো ক'রে জানতে হ'লে এই বিভাগের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানচিত্র আঁকতে হ'লে আগে সারা পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ ক'রে নিতে হয়। কোনো একটা দেশের মানচিত্র আঁকতে হলে সে দেশ ৩৬০ ডিগ্রির কতটা জুড়ে আছে তা প্রথমেই নির্ণয় করা দরকার। এক ডিগ্রির পরিমাণ কত মাইল, তা যে পদ্ধতির সমীক্ষার সাহায্যে নির্দিষ্ট করা যায়, তাকেই বলে 'ত্রিকোনমিতিক সমীক্ষা', অর্থাৎ যে অঞ্চল সমীক্ষা করতে হবে, তাকে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ত্রিভুজে ভাগ ক'রে প্রত্যেকটির দুটি ভুজের পরিমাণ ঠিক করা প্রয়োজন। এ-কাজ করতে হলে প্রথমে সুবিস্তৃত সমতলভূমি নিয়ে আট-দশ মাইল দীর্ঘ একটি সরল

রেখা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমীক্ষা করতে হয়, এই আট-দশ মাইল বিস্তৃত রেখাকেই বেস-লাইন, তথা তল-রেখা বলে। তারপরে দূরের কোনো একটা উঁচু ঢিবি, গাছপালা বা বাড়ি নিশানা ক'রে নির্দিষ্ট তুল-রেখার দুই প্রান্ত থেকে থিওডোলাইট যন্ত্র সাহায্যে সেই নিশানার প্রতি লক্ষ্য করলে কোণ বেরিয়ে আসে। তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে কাগজের উপর ত্রিভুজ আঁকতে হয়। কোনো একটি ত্রিভুজের একটি ভুজ ও দুটি কোণ পাওয়া গেলে অপর দুটি ভুজের পরিমাণ ত্রিকোনমিতিক গণিতের সাহায্যে সহজেই পাওয়া যায়। এই দুই নির্দিষ্ট ভুজ নূতন দুটি ত্রিভুজের তল-রেখা ধ'রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণনা করলেই তার দুই ভুজের পরিমাণ-ফল পাওয়া যাবে। ভূপৃষ্ঠের নতোন্নত অবস্থা পরিমাপ করবার এইটিই সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি এবং এ-পদ্ধতির প্রবর্তক হচ্ছেন জর্জ এভারেস্ট।

সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকাকালে রাধানাথ জর্জ এভারেস্টের কাছে উচ্চ গণিত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং অচিরে অঙ্ক-শাস্ত্রে এমন পারদর্শিতা লাভ করেন যে, তাঁর মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে এভারেস্ট তাঁকে কাছ-ছাড়া করতে চাননি। এ সময়ে উচ্চশিক্ষিত বহু বাঙালী মোটা বেতনে সরকারী চাকরির অনুগ্রহ পেতে লাগলেন। হিন্দু কলেজে রাধানাথের সতীর্থদের প্রায় প্রত্যেকেই তখন ডেপুটি কালেক্টরের চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছেন। বন্ধুদের পরামর্শে রাধানাথও এই চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ এভারেস্ট রাধানাথকে ছাড়তে চাইলেন না, উপরন্তু তিনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখলেন যে, সমীক্ষা বিভাগের কাজ ছেড়ে রাধানাথ অন্য কোনো চাকরিতে যাতে যেতে না চায় অবিলম্বে তার অনুকূল ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ রাধানাথের মত লোক বিলাতেও পাওয়া দুষ্কর।

এভারেস্টের এই চিঠির ফলে রাধানাথ সমীক্ষা বিভাগ ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারেননি এবং চাকরির ক্ষেত্রেও পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ কাজও তাঁর উপর আসতে লাগল। এই সময় তিনি আর সাধারণ কম্পিউটর বা গণনাকারী রইলেন না, সমীক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কাজে নিযুক্ত হলেন।

মারে তাঁর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন, ১৮৪৯ সালে শিকদার দেরাদুনে ছিলেন না, ছিলেন কলকাতায়। কথাটা তাঁর যুক্তির পক্ষে আংশিক সত্য হলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১৮৪০ সাল পর্যন্ত রাধানাথ দেরাদুনে এভারেস্টের অধীনেই কাজ করেছেন। রাধানাথের পিতা তিতুরাম শিকদারকে লেখা এভারেস্টের এক চিঠিতে এই তথ্য পাওয়া যায়। এভারেস্ট লিখেছেনঃ—

দেরাদুন,
৩রা জুলাই, ১৮৪০

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে আপনার পুত্র আমার কাছে ছুটির আবেদন করেছেন। আমি ছুটি দিতে রাজী হয়েছি, যদিও জানি যে, এ সময়ে তাঁকে ছুটি দিলে কাজের ব্যাপারে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হবে। জরুরী সরকারী প্রয়োজনের অনেক কাজের দায় আমার অফিসে এখন জ'মে রয়েছে। এই অবস্থায় অফিসের কাজে যাঁদের সাহায্য সবচেয়ে বেশী দরকার, আপনার পুত্র হলেন তাঁদেরই একজন। ভাল হতো, যদি আপনিই দেরাদুনে আসতেন। আপনি দেরাদুনে এলে আমি আমার মনের এই পরিচয় আপনাকে জানিয়ে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম যে, যিনি

রাধানাথের মতো পুত্রের পিতা, তাঁর প্রতি আমি কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। শুধু তাই নয়, আপনি নিজেই দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন, আপনার পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর সমপর্যায় ও উচ্চ-পর্যায়ের পদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

জর্জ এভারেস্ট

এভারেস্টের এই চিঠিই একথা প্রমাণিত করে যে, রাধানাথ দেরাদুনেই ছিলেন এবং সকল কর্মীর কাছেই তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিশেষ ক'রে এভারেস্টের কাছে রাধানাথের মূল্য যে কতখানি ছিল, তার পরিচয় এই চিঠিতেই আছে।

মারে তাঁর গ্রন্থে একথাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, রাধানাথ হিমালয় অঞ্চলে সমীক্ষার কাজে কখনও ছিলেন না, তিনি বরাবর কলকাতায় সার্ভে অফিসে কেরানির কাজই করে এসেছেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ যখন জর্জ এভারেস্টের লেখা গ্রন্থটি রাধানাথকে উপহার দেন, তখন তাঁরা সেই গ্রন্থের উপর লেখেন—

"বাবু রাধানাথকে—সমীক্ষার কার্যে যিনি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার ক'রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এই গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিলেন।"

একথা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাধানাথ স্বয়ং সমীক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বই লেখার কয়েক বছর পর, অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জর্জ এভারেস্ট অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন কর্নেল এণ্ড্রু অ। তিনি ১৮৬১ সাল পর্যন্ত সার্ভেয়র জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এণ্ড্রু অ'র

সময়ে ১৮৫০ সালে রাধানাথ আরেকবার কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। এণ্ড্রু অ রাধানাথের কর্মক্ষমতা ও গুণপনায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না, উপরন্তু কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানালেন রাধানাথের বেতন-বৃদ্ধির জন্য। তাঁরই চিঠির ফলে রাধানাথ কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে ৬০০ টাকার বেতনে চীফ কম্পিউটরের পদে উন্নীত হলেন। কলকাতা অফিসে এসে রাধানাথ হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পর্যবেক্ষণের ফলে নানা গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার ফলাফল গণনায় লিপ্ত হলেন। ১৮৪৫—১৮৫০, এই সময়ে হিমালয়ের উন-আশিটি গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এদের মধ্যে ৩৯টির নেপালী বা ভুটানী নাম পাওয়া যায় এবং সমীক্ষা বিভাগ সে নাম গ্রহণ করেন। অবশিষ্টগুলি কোনো স্থানীয় নাম না পাওয়ায় ১, ২, ৩ সংখ্যা দ্বারা অভিহিত হ'তে থাকে। এদের মধ্যে ১৫নং শৃঙ্গটিই যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ১৮৫২ সালে রাধানাথ তা আবিষ্কার ও প্রমাণ করেন। সমীক্ষা বিভাগের প্রিয়জন, শ্রদ্ধাভাজন জর্জ এভারেস্টের নাম অনুসারে শৃঙ্গটির নাম দেওয়া হলো মাউণ্ট এভারেস্ট। সে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

রাধানাথ শিকদারের এই আবিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ কর্তৃপক্ষ ১৮৫২ সালের শেষ দিকে তাঁকে চীফ কম্পিউটর পদের সঙ্গে সঙ্গে অবজারভেটরির, অর্থাৎ আবহ বীক্ষণাগারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত করেন। কিন্তু তাঁর এই পদোন্নতি ও সম্মানকে তাঁর সহকর্মী একদল ঈর্ষাকাতর ইংরেজ সুনজরে দেখলেন না। একজন 'নেটিভ' এত বড় হবে, এই সম্মানের পদে আদৃত হবে, এ তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। অথচ এণ্ড্রু অ'র প্রিয়পাত্র বলে রাধানাথের বিরুদ্ধে তাঁরা কিছু বলতেও পারছিলেন না। কিন্তু সুযোগ ঘটে

গেল। ১৮৬১ সালে এণ্ড্রু অ অবসর গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জায়গায় সার্ভেয়র জেনারেল হয়ে এলেন এইচ এল থ্যুলিয়েরের। রাধানাথের বিরুদ্ধে ঈর্ষাজনিত যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এতকাল চাপা ছিল, থ্যুলিয়েরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই সম্মানিত পদ থেকে রাধানাথকে অপসারণের চক্রান্তও ইংরেজদের মধ্যে শুরু হ'য়ে গেল। থ্যুলিয়ের সাহেব এই চক্রান্তের প্রভাবে পড়ে সমীক্ষা বিভাগের কাজ ঢেলে নতুন ক'রে সাজাতে হবে, এই অছিলায় সেই বছরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে জে টি ওয়াকার নামে এক ব্রিটিশকে এনে বসালেন। এ অপমান রাধানাথকে মর্মান্তিকভাবে পীড়িত ক'রে তুলল। যিনি আপন কৃতিত্বের জোরে ত্রিশ বছর ধ'রে সসম্মানে কাজ ক'রে এসেছেন, জর্জ এভারেস্ট ও এণ্ড্রু অ'র মতন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ইংরেজ যাঁর গুণের সমাদর করতে কোথাও কার্পণ্য দেখাননি, তিনি একজন অর্বাচীন ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও অপমান কী ক'রে মেনে নিতে পারেন! তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ-পত্র পেশ করলেন। থ্যুলিয়ের সাহেব ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত একজন ইংরেজ, এই আভিজাতিক উত্তাপে তাঁর রক্ত তখন গরম। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দেবে—একজন নেটিভের কাছে তিনি এতটা আশা করেননি। তিনি পদত্যাগ-পত্র গ্রহণে টালবাহানা শুরু ক'রে দেওয়াতে রাধানাথের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। তিনি ১৮৬২ সালের মার্চ মাস থেকে দপ্তরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। রাধানাথ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকেই চক্রান্ত শুরু হ'য়ে গেল, কি করে তাঁর কৃতিত্বটুকু ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে ফেলা যায়। প্রথমত, তাঁরা রাধানাথকে সমীক্ষা বিভাগের একজন সামান্য কেরানি বলে প্রতিপন্ন করতে উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন। রাধানাথ নিজে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে সমীক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং সমীক্ষার সুবিধার জন্য জর্জ এভারেস্ট

যে 'এক্স-রে পদ্ধতি' আবিষ্কার করেন, রাধানাথই সর্বপ্রথম তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ক'রে সমীক্ষা বিভাগে সেই পদ্ধতি চালু করেন, একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য থুলিয়ের সাহেব ও তাঁর দলবল সচেষ্ট হ'য়ে ওঠেন।

রাধানাথ এই ক্ষুদ্রতা ও নীচতা ইংরেজদের কাছে আশা করেননি। যে ইংরেজ তাঁকে একদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন, সেই ইংরেজই আজ তাঁকে অপমানের ধুলো-কাদায় টেনে নামাতে চায়। রাধানাথের মন গ্লানিতে ভরে গেল। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ঘনিষ্ঠভাবে গুণী ইংরেজদের সঙ্গে মিশে তাঁর মনে তাঁদের প্রতি যে প্রীতি সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তা ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হল।

মনের মধ্যে নিত্যনিয়ত এই দ্বন্দ্ব; এবং বিশ্বাস ও প্রীতি হারানোর এই শূন্যতা সমস্ত জীবনকে যেন হতাশার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ক'রে তুলল। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো নালিশ, কোনো অভিযোগ না রেখেই তিনি চাকরি থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। ১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি পেনসন নিলেন। খবরটা কাগজে কাগজে বের হল। এদিকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাপার ভুলে এক অদ্ভুত কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। 'পেনসন' কথাটা ভুলক্রমে ছাপা হ'ল 'পয়জন্'। তারপর থেকেই চালু হয়ে গেল, রাধানাথ বিষ পান ক'রে আত্মহত্যা করেছেন।

মনের সব গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলে তিনি তাঁর জীবনের বাকী আট বছর স্বদেশের মঙ্গলকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সমাজ-সংস্কারমূলক নানা হিতকর কাজে তিনি যোগ দিলেন, অপর-দিকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'য় নিয়মিত লিখতে লাগলেন। তখন 'মাসিক পত্রিকা'য় একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরে দুলাল' লিখে চলেছেন,

রাধানাথ করছেন মূল ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য থেকে নানা কাহিনীর অনুবাদ।° এ'দের দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার রীতির বন্ধন থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

১৮৭০ সালের ১৭ই মে হুগলীর অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় গঙ্গাতীরে নিজের বাগানবাড়িতে ৫৭ বৎসর বয়সে রাধানাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে থুলিয়ের সাহেব আরেকবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন ইতিহাসের পাতা থেকে রাধানাথের নাম একেবারেই মুছে ফেলতে। কিন্তু রাধানাথের কয়েকজন সহকর্মী ইংরেজ বন্ধুরই চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। তাঁরা তৎকালীন 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকায় থুলিয়েরের এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

যেদিন এক বাঙালী সন্তান পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উচ্চতার পরিমাপ নির্ণয় ক'রে পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের পরিচয় আবিষ্কার করেছিলেন, তার ঠিক এক শতাব্দী পরে সেই শৃঙ্গে প্রথম উপস্থিত হলেন পশ্চিমবঙ্গেরই এক অধিবাসী। গত ত্রিশ বছর ধ'রে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের যে অভিযান পৃথিবীর নানা দেশ নানাভাবে ক'রে এসেছে, সে অভিযানের ইতিবৃত্ত অপরাজেয়কে জয় করবার এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

অ ভি যা নে র কা হি নী

॥ প্রথম পর্যায় ॥

অভিযানের শেষ নেই মানুষের, অভিযানই যেন তার প্রাণ। শতবর্ষ আগে পৃথিবীর অভিযাত্রী মানুষ তার অভিযানের আর একটি শিখর দেখতে পেয়েছিল। এ শিখরের নামকরণ করা হয়েছিল 'এভারেস্ট শৃঙ্গ'। কিন্তু পরে জানা গেছে, এই উচ্চতম চূড়াটির তিব্বতী নাম আগে থেকেই ছিল—চোমোলাংমা, অর্থাৎ জগজ্জননী।

১৯০৯ সালে ও ১৯১১ সালে যথাক্রমে উত্তরমেরু ও দক্ষিণ-মেরু জয়ের পর থেকে এভারেস্ট আরোহণই হলো অভিযাত্রীদের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে উদ্যোগও শুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু এ-কাজ সহজ কাজ নয়। প্রথমেই চিন্তা হলো সত্যি সত্যিই এই পর্বতচূড়ায় ওঠা সম্ভব কি না; যদি-বা সম্ভব, তাহলে কোন্ রাস্তা ধ'রে যাত্রা করা কর্তব্য। ১৯০৭ সালে সর্ব-প্রথম এভারেস্ট আরোহণের স্বপ্ন মানুষের মনে প্রবেশ করে। কিন্তু তার কয়েক বছর বাদেই ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সে স্বপ্নটা যায় ভেঙে। ১৯১৯ সালে লড়াই শেষ হবার পর নতুন ক'রে আবার এ বিষয় নিয়ে সকলে চিন্তা করা আরম্ভ করে। কিন্তু এভারেস্টে আরোহণ করতে হ'লে তো তিব্বতের পথেই যেতে হবে! অথচ নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে প্রবেশ করতে হ'লে প্রয়োজন দলাই লামার অনুমতি। রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়ংহাজব্যান্ড এ বিষয়ে উদ্যোগ দেখান। এবং তাঁরই পরামর্শে প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক কর্নেল হাওয়ার্ড-বেরি ভারতের বড়লাটের সঙ্গে দেখা ক'রে সিকিমের পলিটিক্যাল এজেন্টের সহযোগিতায় দলাই লামার অনুমতি পান। দলাই লামা লিখিতভাবে

অনুমতি দেন যে, তিব্বতে অভিযাত্রীরা প্রবেশ করতে পারবে এবং এভারেস্ট অভিযানে যেতে পারবে। এ ঘটনা ঘটে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯২১ সালে আরম্ভ হ'ল প্রথম এভারেস্ট অভিযান। অভিযানে অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল হাওয়ার্ড-বেরি। তাঁর দলের প্রথম কাজ হল পর্যবেক্ষণ করা এবং এভারেস্টে পৌঁছবার সবচেয়ে সোজা রাস্তা খুঁজে বার করা। কেননা, এর আগে কেউই এভারেস্টের ষাট মাইলের চেয়ে বেশী কাছে যেতে পারেনি। তাঁর দলে তিনি চারজন পাকা পর্বত-আরোহী নিলেন। তাঁরা হচ্ছেন—হ্যারল্ড রয়েবার্ন, ডক্টর কেলাস, ম্যালরি ও বুলক। এ ছাড়া তাঁর দলে রইলেন বৈজ্ঞানিক ও সার্ভেয়ার। সবসমেত দলে ন'জন। ১৯২১-এর মে মাস। সদলে তাঁরা এসে পৌঁছলেন দারজিলিঙে এখান থেকে এভারেস্ট সোজাসুজিভাবে একশ' মাইল দূর, কিন্তু হেঁটে যেতে হ'লে তিনশ' মাইলের উপর। দারজিলিঙে তাঁরা মাল বহনের জন্যে মালবাহী ভেড়া ও খচ্চর সংগ্রহ করলেন এবং পথ-প্রদর্শকরূপে নিলেন একদল শেরপা।

শেরপা কথার মানে হচ্ছে গিরিশার্দুল। এরা না হ'লে এভারেস্ট অভিযান সম্ভব হবে না, অভিযাত্রী দল তা জানতেন। কেননা, পাহাড়ের পথঘাটের সঙ্গে শেরপাদের যেমন পরিচয়, পাহাড়ের মন-মেজাজের খবরও তারা তেমনি রাখে। অভিযাত্রী দল আসলে হচ্ছেন সংগঠক, কিন্তু তাঁদের এই দুর্গম পথের যাত্রায় তাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় এদেরই উপর। এরা পাহাড়েরই জীব—পাহাড়েই এদের ঘরবাড়ি, আধা-যাযাবর ধরনের মানুষ এরা। পাহাড়ের নানা উচ্চতায় এরা বাস করে, বিভিন্ন ঋতুতে নিজেদের পালিত পশুদের চারণের জন্যে বা শস্যসংগ্রহের জন্যে এরা পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠানামা করে। এই সব কারণে পাহাড়ের নানা

উচ্চতার আবহাওয়ার সঙ্গে এদের শরীর ও মন খাপ খেয়ে গেছে। তাই, পাহাড়ের খুব উ'চু অঞ্চলে উঠলে সেখানকার তীব্র আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে এদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এই সব কারণে অন্যান্য পর্বতবাসী বা সমতলবাসীদের চেয়ে শেরপারা এই ধরনের অভিযানে খুব তৎপরতা দেখাতে পারে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এইটেই বড় কথা বা শেষ কথা নয়। পর্বত অভিযানে আরও যা দরকার, শেরপারা সে-সবেরও অধিকারী। তাদের শরীর খুব শক্ত ও মজবুত, এবং মন খুব প্রফুল্ল। সহজে তারা দমে যায় না, নিরুৎসাহ হয় না। তারা ছেলেবেলা থেকে এমন ভাবে মানুষ হয়, যার জন্যে তারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভর। লেখাপড়া হয়তো তারা বেশী করে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, স্বভাবতই তারা প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। তারা জীবনের শিক্ষা লাভ করে অভিজ্ঞতা দিয়ে। বলেছি, তারা সর্বদাই প্রফুল্ল, তাদের মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে। এই রকম মেজাজই পর্বত অভিযানে দরকার। কেননা, দুর্গম দুরারোহ পথে তুষারমণ্ডিত নির্জনতার মধ্যে অনেক সময় মনের উপর গুমট ভাব নেমে আসা স্বাভাবিক। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দিয়ে এই গুমট যে দূর ক'রে দিতে পারে, সে-ই পর্বত অভিযানের উপযুক্ত, এবং সে-ব্যক্তি হচ্ছে একজন শেরপা। শেরপারা এমন ভাবে মানুষ যে তারা কোনো কাজকেই কঠোর ও কঠিন মনে করে না। তাদের জীবন যেন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ দিয়েই তৈরি। অভিযানই যেন তাদের জীবনের একমাত্র কাজ।

এভারেস্ট অভিযানে এই শেরপারা অপরিহার্য অনুষঙ্গী। এরা না হলে অভিযানে সাফল্যের কথা দূরে থাক্, পর্বত অভিযানের ঝুঁকি নিতেও কেউ ভরসা করত না।

হাওয়ার্ড-বেরি এ কথা জানতেন, তাই তাঁর এই প্রথম উদ্যমের
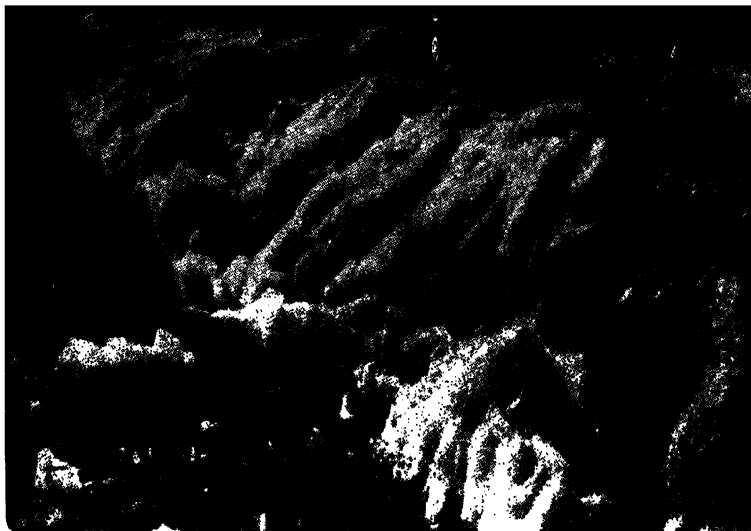
উপরে : গিরিগাত্রে স্তবকিত তুষারপুঞ্জ
নীচে : ভয়াল 'খুনী বরফ'-এর প্রবাহ
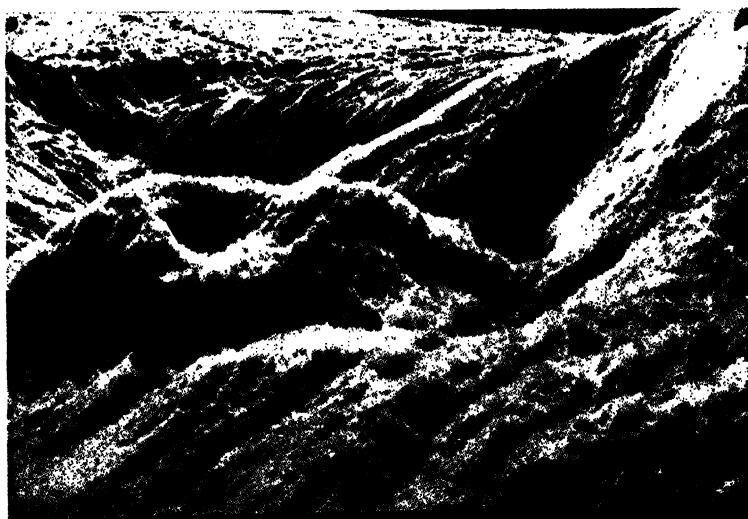
উপরে : দুর্লঙ্ঘ্য তুষার প্রাচীর
নীচে : শান্ত হয়েছে 'খুনী বরফ'
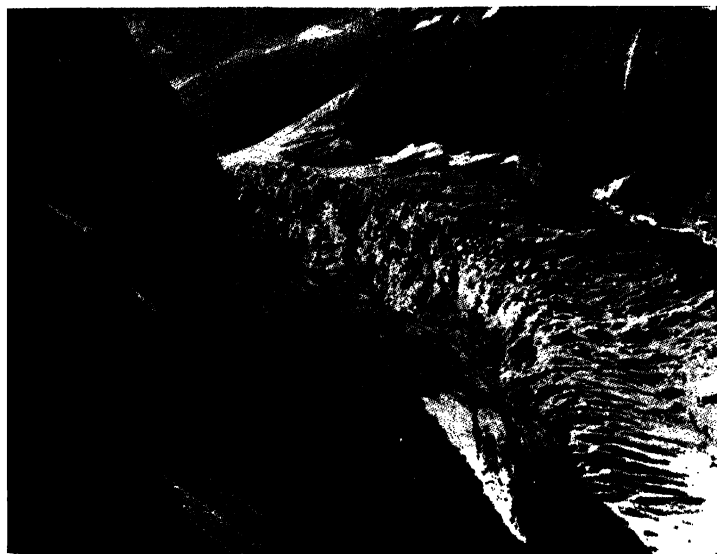
প্রথম কাজ হলো শেরপাদের সঙ্গী ক'রে পাওয়ার উদ্যম। পথ-প্রদর্শক রূপে তিনি সঙ্গে নিলেন একদল শেরপা, এবং মালবহনের জন্যে শ-খানেক খচ্চর।

১৮ই মে তাঁরা রওনা হলেন। তিস্তানদীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা ধ'রে তাঁরা উপর দিকে চললেন। এসে পেঁাছলেন তিব্বতে, সমতল থেকে ১৪,৩৯০ ফুট উচ্চতায়। উপস্থিত হলেন তিব্বতের মালভূমিতে। এখানে কোনো গাছ নেই, বৃষ্টিপাত হয় সামান্য—জায়গাটা তাই মরুভূমির মত। আরো চলতে চলতে ৫ই জুন তারিখে তাঁরা ১৭০০০ ফুট উচ্চে উঠলেন। সেখানেই তাঁবু ফেলে সে-রাত্রে বিশ্রাম নিলেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গের ডক্টর কেলাস এখানে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন।

সঙ্গী হারানোর শোকে মুহ্যমান হয়ে পরদিন ডক্টর কেলাসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা সর্বপ্রথম দেখতে পেলেন এভারেস্ট। কিন্তু এখান থেকেও এভারেস্টের দূরত্ব কম নয়। একশ' মাইলের মত।

হিমালয় অভিযানের তিনটি মূল সূত্র হচ্ছে—(১) পর্যবেক্ষণ, (২) পর্যবেক্ষণ, এবং (৩) পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কিছুতেই এই দুরারোহ পর্বতের সন্নিকটে যাবার পথ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এবং, হাওয়ার্ড-বেরির এই অভিযানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা। তাঁর দলের দুইজন তরুণ পর্বত আরোহী ম্যালরি ও বুলকের মনে মনে যদিও ইচ্ছে ছিল যে, যতটা সম্ভব উচ্চে তাঁরা উঠবেন, কিন্তু তাঁদের প্রথম কাজ ছিল পাহাড়ের আকার সম্বন্ধে একটা পাকা ধারণা করে নেওয়া এবং এভারেস্টের চারদিকে ছোট ছোট যে সব চূড়ার মিছিল আছে সেগুলি কি ভাবে অবস্থান করছে তা জেনে নেওয়া। কিন্তু এ-কাজটাও সহজ কাজ নয়। ম্যালরি ও বুলক তাঁদের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন, এবং কাজটা কতটা যে কঠিন তাও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। কেননা, একটা বিরাট পাহাড়ের অরণ্য তাঁদের চোখের সামনে, তার মধ্যে থেকে এভারেস্ট পাহাড়টা খ‍ুঁজে বার করাই দ‍ুঃসাধ্য। ম্যালরি মন্তব্য করেছিলেন, 'অভিযান পরের কথা। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পাহাড়টা খ‍ুঁজে বার করা।'—তা না হলে কার গা বেয়ে উঠে ঐ স‍ু-উচ্চ চ‍ূড়ায় পেঁাছনো যাবে?

পাহাড় অন্বেষণ করাটা দ‍ুর‍ূহ কাজ। এটা একটা মায়ার মত! দ‍ূর থেকে চোখে দেখে মনে হয় অতি কাছে, যতই তার কাছে এগ‍ুনো যায় ততই সে সরে যায়, দ‍ূরত্ব কমতে চায় না কিছ‍ুতেই।

২৩শে জ‍ুন ম্যালরি ও ব‍ুলক ষোলো জন পথপ্রদর্শক শেরপা সঙ্গে নিয়ে পাহাড় পর্যবেক্ষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা প্রথমে উত্তর দিক থেকে এভারেস্ট অন‍ুসন্ধান আরম্ভ করলেন। বহ‍ু পথ ঘ‍ুরতে ঘ‍ুরতে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন একটা সমতল জায়গায়—এর নাম রংব‍ুক। এখানে পেঁাছে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন, যে-পাহাড় তাঁরা খ‍ুঁজছেন তার পাদদেশ থেকে চ‍ূড়া পর্যন্ত সবটা তাঁরা দেখতে পেলেন এখান থেকে। এ জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৫০০ ফুট। এখানে তাঁরা বেস্-ক্যাম্প গাড়লেন। এবং এখান থেকেই শেষরাত্রি ৩টা নাগাদ তাঁরা প‍ৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন! আকাশে সেদিন প‍ূর্ণচাঁদ এবং মাথার উপরের অন্ধকার তারা-খচিত। এই আলোতে পথ আলোকিত। তাঁরা পাহাড়ের দিকে পাঁচ মাইল অগ্রসর হলেন। পাহাড়ে পাঁচ মাইল হাঁটা কম কথা নয়, তাঁরা ১৮,৫০০ ফুট উপরে এলেন। এখানে পেঁাছে নিশ্বাসের কষ্টে অস‍ুস্থ বোধ করতে লাগলেন, ঘণ্টা পাঁচেক বাদে তাঁরা ফিরে এলেন তাঁব‍ুতে।

২৯শে জ‍ুন তাঁরা ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে ২নং তাঁব‍ু গাড়লেন। এখান থেকে ১লা জ‍ুলাই তারিখে ব‍ুলককে রেখে ম্যালরি একা

পাঁচ জন শেরপা সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই তাঁর মনে হলো, ওই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা একান্তই কি সম্ভব? ১৯,১০০ ফুট উঁচু থেকে ম্যালরি নর্থ কল্ দেখতে পেলেন। এ পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এভারেস্টে পৌঁছনো যাবে না বুঝতে পেরে তিনি ঠিক করলেন, পশ্চিম দিক থেকে এগুতে হবে। কিন্তু তাঁর সম্মুখে মেঘ জমেছে, তার জন্যে তিনি বুঝতে পারলেন না পশ্চিম দিক দিয়ে একান্তই কোনো কল্ আছে কি না। তিন মাইল পথ চড়াই বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে এগিয়ে ম্যালরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেখলেন, এদিক দিয়ে কোনো পথ নেই, এদিকে খাড়া উঁচু বরফের পাহাড়।

৮ই জুলাই তাঁরা ৩নং ক্যাম্প গাড়লেন—পশ্চিম রংবুক গ্লেসিয়ারে। কিন্তু চারিদিক মেঘে ছাওয়া। কোনো উদ্যোগই তাই সম্ভব নয়। ১১ই জুলাই ম্যালারি ও বুলক ভোর বেলা রওনা হলেন। কিন্তু তুষার ও বরফের বেষ্টনীর মধ্যে প'ড়ে তাঁরা আটক প'ড়ে গেলেন। এইজন্যে তাঁদের ফিরে আসতে হল।

এর পর দিনকয়েক তাঁরা কেবল আশ-পাশ পরিদর্শন করে বেড়ালেন এবং ফটো নিলেন।

২০শে জুলাই তাঁরা তিনটি ক্যাম্পই ভেঙে দিয়ে এখান থেকে সরে গেলেন। এ পথে কোনো সুবিধে হবে না, তাঁরা বুঝতে পারলেন। তাঁদের এতদিনের পর্যবেক্ষণের কোনো ফল হলো না। তাই তাঁরা ঠিক করলেন পূর্ব দিক দিয়ে কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা, তা অন্বেষণ করতে হবে। ২৫শে জুলাই তাঁরা শেষ তাঁবু তুলে দিয়ে ফিরে চললেন। দলবল-সহ অধিনায়ক হাওয়ার্ড-বেরি নীচে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ম্যালরিরা মিলিত হলেন।

ম্যালরিরা যখন উত্তর দিক থেকে পথ অন্বেষণ করছিলেন, তখন

তাঁদের দলের অন্যান্য সভ্যরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মোর্সহেড ও হুইলার বারো হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের ছবি তুলে তুলে সমস্ত জায়গাটা সার্ভে করার ব্যবস্থা করছেন। এবং হাওয়ার্ড-বেরি খাত্রা জেলায় একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে তাঁবু ফেলে সেখান থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ চালাবার জন্যে ব্যবস্থা করছেন। ২৯শে জুলাই অভিযাত্রী দলের সকলে এসে এই নতুন তাঁবুতে জমায়েত হলেন। ম্যালরি ও বুলক পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই তাঁবুতে দিন-চারেক বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এই খাত্রা নদীটার উৎস কোথায়?—চাঙ্গা হয়েই তাঁদের মনে এই জিজ্ঞাসাটার উদয় হলো। ম্যালরির মনে হলো, এর উৎস সন্ধান করতে করতে তিনি নিশ্চয় নর্থ কল্-এর সন্ধান পাবেন। খাত্রা নদীর উপত্যকা বরাবর অগ্রসর হলে দিন-দুয়ের মধ্যে তাঁরা নর্থ কল্-এর চাক্ষুষ দেখা পাবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস হলো তাঁদের। ২রা অগস্ট শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু কোনো হদিশ পেলেন না। শেরপারা বলল যে, চোমোলাংমা (এভারেস্ট) যেতে হলে উত্তর-পশ্চিমের উপত্যকা ধ'রেই যেতে হবে। ম্যালরি তাদের কথা অনুসারে চললেন। তাঁরা গিয়ে উঠলেন ১৮,০০০ ফুট উচ্চে। এখানে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন মনোরম ও মনোমুগ্ধকর উপত্যকা আর নেই।

সম্মুখের পাহাড় মেঘে ঢাকা। ৫ই অগস্ট মেঘ কাটল। তাঁরা দেখলেন দূরে বরফ-প্রাচীরে ফাটল ধ'রে প্রাচীর ধ্বসে পড়ছে, পাহাড়ের ঢালু দিয়ে পিছলে নেমে আসছে বৃহৎ বৃহৎ বরফের চাপ। এই সব ভয়ংকর দৃশ্যের ওপারে, তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন, অটল অচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তুষারশুভ্র এভারেস্ট— চোমোলাংমা।

দূর থেকে দেখা গেল বটে, কিন্তু কিভাবে ওর পাদদেশে পৌঁছনো যায়, এই হলো সমস্যা। তবু উৎসাহী ম্যালরি দুজন

তরুণ শেরপা সঙ্গে নিয়ে নর্থ কল্-এর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন নীচে নর্থ কল্—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মেঘ এসে সব দৃশ্য মুছে দিল। শেষ মুহূর্তের এই ব্যর্থতা সত্যিই মর্মান্তিক। সম্ভবত, পরিশ্রমের উপর এই মানসিক আঘাতের জন্যেই ম্যালরি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

যে নর্থ কল্ ম্যালরি দেখতে পেয়েছেন, তা আরোহণ করা সম্ভব কিনা, এই চিন্তায়ই তাঁরা ডুবে রইলেন।

২০শে অগস্ট তারিখে তাঁরা নেমে এলেন খাত্রার বেস্-ক্যাম্পে। আর সকলেও এখানে এসে মিলিত হতে লাগলেন। এখান থেকে নতুন ক'রে অভিযান আরম্ভই হলো এই মিলনের উদ্দেশ্য। এই দলের পর্যবেক্ষণ কেবল পাহাড়ের পথ অন্বেষণের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়নি; পাহাড়ে বাতাসের গতি, আবহাওয়ার হাবভাব, তুষার ও বরফের অবস্থা ইত্যাদি খুঁটিনাটি ক'রে জেনে নেওয়াও ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

এদিকে মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তাই হাওয়ার্ড-বেরির দল এখানকার তাঁবুতে বৃষ্টি-সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে রইলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর মৌসুমী হাওয়া ক্ষান্ত হলো। পরদিনই ম্যালরি বুলক মোর্সহেড ও হুইলার চোদ্দ জন শেরপা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম দিকে তাঁরা তাঁদের পথে পেলেন কঠিন তুষার। তাই তাঁদের ফিরে আসতে হলো। ২২শে তারিখে তাঁরা দেখতে পেলেন হরিণ ও শৃগালের পায়ের দাগ, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁরা এমন পায়ের দাগও সেই সঙ্গে দেখতে পেলেন, যে দাগ অবিকল মানুষের পায়ের চিহ্নের মত। শেরপারা এই দাগ দেখে তখনই বলল, এ হচ্ছে মেটোকাংমির, অর্থাৎ অতিকায় তুষার-মানবের, পায়ের দাগ। তাঁরা এগিয়ে চললেন, এবং পরদিন সকালের দিকে তাঁরা নতুন একটা তাঁবু গাড়লেন নর্থ কল্-এর

নীচে। ২৫শে তারিখে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে পোঁছবার চেষ্টা করলেন—খোদ নর্থ কল্-এই তাঁরা আর-একটা তাঁবু গাড়বেন কিনা। তা করতে হ'লে আরও রসদ ও মালপত্র তাহলে এখানে বয়ে নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু হাওয়ার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল। তাই এ পরিকল্পনা বাতিল ক'রে তাঁরা ২৬শে তারিখে তাঁবু তুলে খাম্রায় ফিরে এলেন।

৫ই অক্টোবর তাঁরা খাম্রা ত্যাগ করেন। এক সপ্তাহ পরে তাঁরা ফিরে এলেন ডক্টর কেলাসের সমাধির পাশে। এখান থেকেও এভারেস্ট দেখা যায়। এখানে তাঁরা ডক্টর কেলাসের সমাধির উপরে একটা পাথর বসিয়ে তাতে ইংরেজী ও তিব্বতীতে কেলাসের নাম লিখে রেখে এলেন।

১৯২১এর পর্যবেক্ষণ শেষ হল এইভাবে।

হাওয়ার্ড-বেরির দল তিব্বত তখনো ত্যাগ করেন নি। এই সময় লন্ডনে এভারেস্ট-কমিটি ঠিক করলেন যে, ১৯২২ সালে জেনারেল ব্রুসের অধিনায়কত্বে এভারেস্ট-আরোহণের আর-একটা চেষ্টা করা হবে।

ব্রুসের দল গঠিত হলো। এই দলে পাকা পাকা পর্বত-আরোহী যোগ দিলেন। এ'দের মধ্যে রইলেন ম্যালরি, ক্যাপ্টেন ফিন্‌চ, সমারভেল, নর্টন ও ডক্টর ওয়েকফিল্ড। এ'রা সবাই এলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে—এভারেস্ট জয় তাঁরা করবেনই। এ'দের দলে ছবি তোলার, মালপত্র বহনের তদারকি করার এবং সার্ভের জন্যে রইলেন আরো কয়েকজন।

ব্রুসের পরিকল্পনা হলো পূর্ব-রংবুকে তাঁবু ফেলে অভিযান আরম্ভ করা, এবং এপ্রিল মাসেই তাঁবু ফেলা, যাতে মৌসুমী

বৃষ্টি শুরু হবার আগে ছয় সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়। সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই মনসুন শুরু হয়।

ঘোড়া খচ্চর গাধা ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে তিন শ মালবাহী পশু সংগ্রহ করা হলো। ১লা মে এই দীর্ঘ মিছিল এসে ১৬,৮০০ ফুট উঁচুতে মাল খালাস করল। ষাট জন শেরপা সহ রুসের দল এসে পেঁছিল। তাঁবু পড়ল এখানে।

৪ঠা মে আরম্ভ হলো পর্যবেক্ষণের কাজ। তিন দিনে পর্যবেক্ষণকারীরা ২১,০০০ ফুট উচ্চে নয় মাইল অতিক্রম ক'রেও বেশ হৃষ্ট রইলেন। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও তাঁরা পেরেছিলেন। ৯ই তারিখে তাঁরা পূর্ণ বিবরণ নিয়ে বেস্-ক্যাম্পে ফিরে এলেন। ১নং ক্যাম্প ১৭,৮০০ ফুটে, ২নং ক্যাম্প আড়াই মাইল দূরে ১৯,৮০০ ফুটে, ৩নং ক্যাম্প সাড়ে তিন মাইল দূরে ২১,০০০ ফুটে গাড়া হল।

এবার নর্থ কল্-এ যাবার রাস্তা খুঁজে বার করার চেষ্টা আরম্ভ হলো। কিন্তু এখান থেকে ঢালু পথগুলো অত্যন্ত খাড়া নিচু। তিব্বতের পশ্চিমী হাওয়াও গত বছরের মত ভীষণভাবেই বইতে লাগল। এইজন্যে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না, তা ছাড়া আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারায় অভিযাত্রীদের মাথাধরা ইত্যাদি অসুস্থতা দেখা দিল। আরো উপরে ৪নং তাঁবু ফেলার জন্যে তাঁরা উদ্যোগ করতে লাগলেন। ৩নং ক্যাম্পে ম্যালরি সকলকে প্রফুল্ল রাখার জন্যে শেক্সপীয়রের হ্যামলেট ও কিং লিয়র জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। এতে সকলে বেশ চাঙ্গা রইল। ম্যালরি পর্বত-আরোহীদের মধ্যে একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে কখনো তাঁর মন বিষণ্ণ হতো না। ১৯২৪ সালে আরভিনের সঙ্গে

অভিযানে বেরিয়ে এই ম্যালরি হিমালয়ের তুষারে সমাধিস্থ হয়েছেন, কিন্তু সে কাহিনী পরে।

১৬ই মে ৩নং ক্যাম্পে রসদ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পেঁছল। রুসের পরিকল্পনা ছিল এই যে, ম্যালরি ও সমারভেল্ প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করবেন। তাঁদের যাত্রার কিছু পরেই ফিন্চ ও নর্টন (অথবা মোর্সহেড) অক্সিজেনের যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁদের পিছন পিছন রওনা হবেন। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলো না। কেননা, পেটের গোলমালে অসুস্থ হয়ে ফিন্চ বেস্-ক্যাম্পেই আটক পড়ে রইলেন। সময়মত ফিন্চও এসে পেঁছলেন না, অক্সিজেনও এলো না।

ম্যালরি অভিমত জানালেন যে, দলে দুজনের বদলে চারজন থাকাই ভালো। তাঁর মত অনুযায়ী চারজনের দলই তৈরি হলো প্রথম শৃঙ্গারোহণের জন্যে। ১৭ই মে দশজন শেরপা সহ যাত্রা শুরু হলো নর্থ কল্ অভিমুখে। ১৮ই মে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ৩নং তাঁবু থেকে আরো মালপত্র উপরে আনা হলো।

শৃঙ্গারোহণের সুবিধার জন্যে ঠিক হলো ২৬,০০০ ফুটেরও উপরে ৫নং তাঁবু গাড়া দরকার। কেননা, সকলেরই ধারণা—এই রকম একটা তাঁবু ফেললে সেখান থেকে অল্পকষ্টে তিন হাজার ফুট উঠে এভারেস্টে পেঁছানো যাবে। এইভাবে ব্যবস্থাদি করলে এভারেস্ট-অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত বলেই সকলের মনে হলো।

কিন্তু ২৫,০০০ ফুট পর্যন্ত যখন ম্যালরি ও মোর্সহেড উঠেছেন তখন বাতাস খুব জোরে বইতে শুরু করেছে। ২৬,০০০ ফুট ওঠাই তখন দুঃসাধ্য। তাই স্থির হলো, ২৫,০০০ ফুটেই তাঁবু ফেলা হোক। কিন্তু তাঁবু গাড়বার উপযুক্ত খানিকটা সমতল জায়গা পাওয়াই দায় হলো এখানে। অগত্যা একটু ঢালু জায়গাতেই তাঁবু ফেলা হলো। নর্টন ও মোর্সহেড অতিরিক্ত

ঠাণ্ডায় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তবুও দলের কারো উৎসাহ কমে নি। এর আগে কেউ যেখানে তাঁবু ফেলতে পারেনি তাঁরা সেই উচ্চতায় তাঁবু গেড়েছেন, এইটেই তাঁদের উৎসাহের হেতু ছিল।

এখানে পেঁছেও দলের প্রত্যেকের ধারণা হলো যে, আর একদিন আরোহণ করলেই চূড়ায় পেঁছে যাবেন, যদি অবশ্য আবহাওয়া অনুকূল থাকে।

পরদিন প্রাতে অভিযাত্রী-দল রওনা হলো। নর্টন আগে আগে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পরেই মোর্সহেড আর যেতে রাজী হলেন না। সকলে পরস্পরের সঙ্গে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। দড়ি থেকে মোর্সহেডকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। গত রাতের তুষারপাতে চার থেকে আট ইঞ্চি পুরু তুষার জমেছে। তার উপর এত উঁচুতে নিঃশ্বাস নেওয়ার কষ্টও আছে। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর অভিযাত্রী-দলকে বিশ্রাম নিতে হলো। এই রকম একটা জায়গায় ঠাণ্ডায় পা জমে যাওয়ায় ম্যালরি পায়ের জুতো খুলে ফেললেন। বেশী ঠাণ্ডায় পায়ের আবরণ হাল্কা করলে আরাম পাওয়া যায়, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ম্যালরি তা জেনেছেন। উঠতে উঠতে তাঁরা এমন জায়গায় এসে পেঁছলেন যেখান থেকে ২৬,৭৫০ ফুট উঁচু চো-আউ নামক চূড়াটা নীচু বলে মনে হলো। এখানে তাঁরা আহার করলেন। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া গেল না। তাঁরা ৫নং ক্যাম্পে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ৪নং ক্যাম্পে। পরদিন প্রাতে সেখান থেকে নেমে এলেন ৩নং ক্যাম্পে। ব্রুসের দল তুষার-আহত হয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁদের ব্যর্থ হয়ে নেমে আসতে হলো। এইভাবে এবারের অভি-যানও শেষ হলো। কিন্তু পরাস্ত হয়েও তাঁরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এলেন, তার মূল্য সামান্য নয়। তাঁদের অর্জিত

অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিযাত্রীদের পথ দেখাবে—এই ছিল তাঁদের সান্ত্বনা।

এই অসফল অভিযানের আর-একটি পর্বও আছে, এটাকে বলা যায় ফিন্‌চ-পর্ব। ফিন্‌চ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সময়মত অভিযানে যোগ দিতে পারেন নি। সুস্থ হয়ে যখন তিনি ৩নং ক্যাম্পে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর সঙ্গে যাঁর-সঙ্গী হবার কথা ছিল, সেই নর্টন ম্যালরির সঙ্গে নর্থ কল্‌-এর দিকে চলে গেছেন। পাকা কোনো পর্বতারোহী আর ছিলেন না, যাঁকে তিনি সঙ্গীরূপে পেতে পারেন। তাই তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। ব্রুস নিজে তখন ফিন্‌চের সঙ্গে চললেন। এবং তৃতীয় সঙ্গী হলেন ল্যান্স কর্পোরাল তেজবীর। ৩নং ক্যাম্পে এসে তাঁরা দেখলেন অক্সিজেনের সরঞ্জাম বিকল হয়ে আছে। ২১শে মের সন্ধ্যার দিকে তাঁরা পাহাড়ের চারদিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, তাঁদের দলের অগ্রগামী কোনো অভিযাত্রীকে দূরে দেখা যায় কিনা। তাঁরা দূরের সাদা বরফের গায়ে চারটি কালো দাগ দেখতে পেলেন; দেখতে পেলেন, সেই দাগগুলি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে। তাদের চলার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা অত্যন্ত ক্লান্ত। এদের সাহায্যের জন্যে ফিন্‌চ, ব্রুস, ওয়েকফিল্ড ও তেজবীর পরদিন সকালেই জনকয়েক শেরপাকে সঙ্গীরূপে নিয়ে রওনা হলেন। তাঁরা অগ্রগামী দলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তাদের ক্লান্তি দূর করার ব্যবস্থা করলেন।

ফিন্‌চ যখন ২৫,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে, তখন প্রচণ্ড হিম-হাওয়া উঠল। এই হাওয়া ভেদ ক'রে ফিন্‌চ আরও ৫০০ ফুট উপরে উঠলেন। কিন্তু হাওয়ার তীব্রতা কমল না। তিনি দেখে চমকিত হলেন যে, এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়েও শেরপারা গান গাইছে, এবং তাদের দেশের গেঁয়ো ছড়া আবৃত্তি করছে। ব্রুস ও তেজবীর চট্‌পট তাঁবুতে প্রবেশ ক'রে তাঁদের ঘুমোবার খোলের মধ্যে ঢুকে

পড়লেন। শেরপাদের অসীম বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ফিন্‌চ মুগ্ধ হলেন। এদের সম্বন্ধে তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে গেছেন। সম্মুখ-বিপদে পড়লেও এরা কর্তব্যবুদ্ধি হারায় না। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে পাহাড়ের উচ্চভূমিতে অক্সিজেনের সরঞ্জাম নিতে হয়, কিন্তু মনে হয় অক্সিজেন সঙ্গে না থাকলেও যেন চলে, কিন্তু সঙ্গে শেরপা না থাকলে হিমালয়-অভিযান অসম্ভব।

২৭,৩০০ ফুট পর্যন্ত উঠে ফিন্‌চ নেমে আসা ঠিক করলেন। তাঁরা এভারেস্টের আধ মাইলের মধ্যে পেঁাছেছিলেন, কিন্তু খাদ্যের অভাবে তাঁদের নেমে আসতে হলো।

দলের অনেকে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। ব্রুস অসুস্থদের দারজিলিঙে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক করলেন।

৬ই জুন সকালটা খুব মনোরম মনে হয়। প্রখর রোদ উঠেছে। এই তাপে বরফ-গলা শুরু হলো। এর আগেই অভিযাত্রী-দল আবার জমে উঠতে লাগল। পরদিন সকালে তাঁরা নর্থ কল্‌এর উদ্দেশে রওনা হলেন। বৃহদাকার বরফের চাপ খ'সে পড়তে পারে বলে ম্যালরির ধারণা হয়েছিল; এবং এ-ধারণা সত্য বলেই পরে প্রমাণিত হয়। এখানে নয়জন শেরপা বরফে চাপা পড়ে। অভিযাত্রী-দলের অন্যান্য সকলে বরফ কেটে তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র দুইজনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। শেরপাদের অনুরোধে মৃত সাতজনকে সেই বরফের আচ্ছাদনেই রেখে আসা হয়। ৩নং ক্যাম্পে পেঁাছে এই দুর্ঘটনার মর্মান্তিক সংবাদ বেস্‌-ক্যাম্পে পাঠানো হলো। এই দুর্ঘটনাতেও শেরপারা বিচলিত হলো না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষের সময় শেষ হ'য়ে এলেই তার মৃত্যু হয়, মৃত্যুকে ঠেকানো মানুষের সাধ্য নয়। জেনারেল ব্রুসকে তারা জানিয়ে দিল যে, এ অভিযান ব্যর্থই হোক আর মর্মান্তিক ঘটনায় সকলে

নিরুৎসাহই হোক, পরবর্তী এভারেস্ট-অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে তারা কিন্তু রাজী।

এই হচ্ছে শেরপাদের আসল চরিত্র। এই ধরনের নিরাসক্ত ও নির্ভীক চরিত্র না হলে হিমালয়ের মত দুরারোহ পর্বত-অভিযান সম্ভব নয়। এইজন্যেই যাঁরা বার-কয়েক অভিযানে গিয়েছেন তাঁরাই এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, এভারেস্ট-অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে এই শেরপাদের উপরেই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, শেরপারাই যদি অভিযানের সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি, তাহলে তারা নিজেরাই উদ্যোগ ক'রে কেন অভিযানে বের হয় না? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, পাহাড়ে আরোহণের আগ্রহ তাদের বড়-একটা নেই। এর কারণ পাহাড়েই তাদের জন্ম এবং পাহাড়েই তারা লালিত-পালিত। পাহাড়ই তাদের ঘরবাড়ি। এইজন্যে পর্বত-আরোহণকে তারা অভিযান বলেই মনে করে না। তাদের প্রত্যহই পাহাড়ের দেশে ওঠা-নামা করতে হয়। তাছাড়া, চূড়ায় পেঁাছবার জন্যে অভিযানেরই-বা তাদের সময় কোথায়? তাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্যে পাহাড়ের ধাপে ধাপে প্রত্যহই তাদের অভিযান তো লেগেই আছে।

১৯৪২ সালে পুনরায় অভিযানের উদ্যোগ করা হলো। এবারও অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ব্রুস, আর তাঁর সহকারীরূপে মনোনীত হলেন নর্টন। ২৫শে মার্চ অভিযাত্রী-দল দারজিলিঙ থেকে যাত্রা করলেন। ১৯২২ সালের অভিযানে অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবারকার পরিকল্পনা তৈরি করা হলো। এই পরিকল্পনা-রচনায় ম্যালরি অনেক সাহায্য করলেন। তাঁদের ধারণা হলো, এবারকার অভিযান সফল হবেই। তাঁরা ২৫,৫০০ ফুটে ৫নং, ২৬,৫০০ ফুটে ৬নং ও ২৭,২০০ ফুটে ৭নং তাঁবু গাড়বেন ঠিক করলেন। তাহলে

চরম অভিযানটা হবে এভারেস্ট-চূড়ার খুব কাছ থেকেই—৭নং তাঁবু থেকে। ঠিক হলো, এখান থেকে ম্যালরি ও আরভিন প্রথম যাত্রা করবেন, পিছনে পিছনে আসবেন সমারভেল ও নর্টন।

২৮শে এপ্রিল অভিযাত্রী-দল রংবুকে পৌঁছলেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে একটি বৃহৎ শেরপা-বাহিনী। ধাপে ধাপে তাঁবু গাড়তে গাড়তে তাঁরা ক্রমশ উঠে আসতে লাগলেন উপরে। কিন্তু এখান থেকেই অভিযাত্রী-দলকে প্রবল হিম-হাওয়ার মধ্যে পড়তে হলো। ১৯শে মে তাঁরা ৩নং ক্যাম্পে এসে পৌঁছলেন। আরো উপরের ধাপে তাঁবু গাড়বার জন্যে সকলে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ম্যালরি আর নর্টন প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে তাঁবু গাড়বার স্থান নির্বাচনে রত হলেন। এইভাবে বাধাবিঘ্ন হিম-হাওয়া পথকষ্ট ইত্যাদি সব উপেক্ষা ক'রে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

সুউচ্চ ক্যাম্প থেকে চূড়া-অভিযানে বহির্গত হলেন, কিন্তু ম্যালরি ও ব্রুসকে বারকয়েক ফিরে নেমে আসতে হলো। বার বার পরাস্ত হয়েও ম্যালরির উৎসাহ কমল না। তিনি পুনরায় চেষ্টা করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ম্যালরি তাঁর সঙ্গীরূপে নির্বাচন করলেন আরভিনকে।

৬ই জুন তারিখে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের সময় ম্যালরি ও আরভিন বহির্গত হলেন চরম অভিযানে। তাঁরা সঙ্গে নিলেন অক্সিজেন। তাঁদের সঙ্গে চলল আটজন শেরপা—শেরপারা কোনো অক্সিজেন নিল না। বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল, সন্ধ্যার সময় বরফ পড়া শুরু হলো। বিকেল ৫টার সময় ওডেল ম্যালরির কাছ থেকে একটা নোট পেলেন, দু'জন শেরপা এই নোট নিয়ে এল, তাতে লেখা—'এখানে হাওয়ার তীব্রতা নেই, সুতরাং সব আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে।' পরদিন সকালে একজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে ওডেল ৫নং ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন, ম্যালরি ও

আরভিন ইতিমধ্যে ৬নং ক্যাম্পের দিকে চলে গেছেন। ওডেল ৬নং ক্যাম্পে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন উপর থেকে শিলাবৃষ্টির মত পাথরের ধারা নামছে। এতে তিনি ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন, তাঁর মনের উৎসাহ যেন নিভে গেল।

এমন সময় ম্যালরির লেখা একটা নোট নিয়ে চারজন পোর্টার এসে উপস্থিত হলো, ম্যালরি লিখেছেন, 'সব কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গের পাচকটি ঢালু পাহাড়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে। তাঁবুতে আমি কম্পাসটা ফেলে এসেছি—বিনা কম্পাসে চলেছি। ওটা উদ্ধার ক'রে রেখ।'—এইটেই ম্যালরির কাছ থেকে পাওয়া শেষ সংবাদ। তাঁদের আর-কোনো খোঁজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সময়মত ম্যালরি ও আরভিন ফিরে না আসায় ওডেলের ধারণা হলো যে, তাঁরা নিশ্চয় ইতিমধ্যে চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। কিন্তু দিন যায়, তাঁদের কোনো খবর আর পাওয়া যায় না। নীচের ৪নং ক্যাম্পে বিপদসূচক সংকেত পাঠানো হলো। উপর থেকে এ সংকেতের কোনো সাড়াই মিলল না।

অনেক অন্বেষণ করেও কোনো খবর না পেয়ে অভিযাত্রী-দল ১২ই জুন বেস্-ক্যাম্পে নেমে এলেন। কিন্তু ম্যালরি ও আরভিনের কি হলো? কেউ চাক্ষুষ কিছু দেখেনি। কিভাবে তাঁদের দুর্ঘটনা ঘটল, একান্তই তাঁরা চূড়ায় পৌঁছতে পেরেছিলেন কি না—সব কিছুই আজ পর্যন্ত গবেষণার বিষয়ই রয়ে গেছে। অভিযাত্রী-দলের ধারণা এই যে, তাঁরা দু'জন পরস্পরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা ছিলেন, একজনের পা পিছলে যেতেই সেই টানে দু'জনেই ঢালু পথে গড়িয়ে এক অদৃশ্য অতলে পড়ে গেছেন। যত গবেষণাই চলুক, আজো তাঁরা রহস্য হয়েই রয়ে গেছেন।

এতেও অভিযাত্রীরা নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হলেন না, এইসব

দুর্ঘটনা ও মৃত্যুই তাঁদের যেন ইশারা ক'রে পুনরায় অভিযানের ইঙ্গিৎ জানাতে লাগল।

এর পর আট বছর অভিযান স্থগিত ছিল। তার কারণ দলাই লামা আর-কোনো অভিযানের অনুমতি দিতে রাজী ছিলেন না। অবশেষে ১৯৩২ সালে লামা অনুমতি দেন। তাই নূতন ক'রে পুনরায় অভিযাত্রী-দল গঠনের শুরু হয়। ১৯২৪ সালে যাঁরা অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অনেককেই এবার পাওয়া যায় না। তাই নতুন দল গঠনের দরকার হয়। ১৯৩৩ সালের অভিযাত্রী-দলের অধিনায়ক হলেন রাটলেজ। হিমালয় সম্বন্ধে এ'র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল, আলমোরাতে ইনি পাঁচ বছর জেলা কমিশনার রূপে কাজ করে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ'র দলে রইলেন স্মাইথ, এরিক শিপটন, বেস ও' গ্রীন ও বার্নি। এ'রা সকলেই অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ পর্বত-আরোহী। এর আগের তিনটি অভিযানে অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে এবারকার পরিকল্পনা রচিত হলো। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অভিযাত্রী-দল এসে মিলিত হলেন দারজিলিঙে। এখান থেকে যাত্রা করে হিমালয়ে ক্যাম্প ফেলা হলো। ১৭ই এপ্রিল বেস্-ক্যাম্প ফেলা হয়। ১৯২৪ সালে যেদিন ক্যাম্প গাড়া হয় তারও বারো দিন আগে। এবারকার অভিযানে অনেক উন্নত ধরনের তাঁবু ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। ২রা মে ৪নং তাঁবু পড়ে—স্মাইথ ও শিপটন পথ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন। ২২শে মে দিনটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। উইন-হ্যারিস, গ্রীন, বাউস্টেড, বার্নি ও ওয়েগার শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে ২৫,৭০০ ফুট উঁচুতে উঠে ৫নং তাঁবু ফেললেন। জলহাওয়ার অবস্থা খুবই ভালো ছিল। ২৯ তারিখে অভিযাত্রী-দল ২৭,৪০০ ফুটে ৬নং তাঁবু ফেললেন। এখান থেকে সূর্য ওঠার আগেই তাঁরা রওনা হলেন। আড়াআড়িভাবে হেঁটে তাঁরা এগিয়ে চললেন। প্রায় এক

ঘণ্টা হাঁটার পর তাঁরা দেখলেন সূর্য উঠছে। আরো খানিকটা এগিয়েই তাঁরা দেখলেন তাঁদের সামনে বরফ কাটার একটা কুঠার পড়ে। এ কুঠার কার হতে পারে? ম্যালরি ও আরভিন ছাড়া এত উঁচুতে (২৮,০০০ ফুট) তো আর কেউ ওঠেন নি! তাহলে এটা ওঁদেরই দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজনের। তাঁরা কুঠারটা দেখলেন, কিন্তু কুড়িয়ে আনলেন না, যেখানে ছিল সেখানেই রেখে এলেন। এই কুঠারটা পাওয়ায় একটা বিষয় স্থির জানা গেছে—সেটা হচ্ছে দুর্ঘটনার প্রকৃত জায়গাটি। বিপদে পড়ে দুই হাত দিয়ে দাঁড় আঁকড়ে ধরার জন্যে ম্যালরি বা আরভিন কুঠার ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে ঢালুতে এই কুঠার পাওয়া যায়, সেই ঢালুটা বরাবর নেমে গেছে রংবুক তুষার-হ্রদে। ম্যালরি ও আরভিন তাহলে হয়তো এখন সেই তুষার-হ্রদেই সমাধিস্থ।

এই উচ্চতায় উঠে তাঁরা প্রচণ্ড হিম-হাওয়ার সম্মুখীন হলেন। ২৮,০০০ ফুট উপরে পা রাখার জন্যে বরফ কেটে ধাপ তৈরি করা অতি দুরূহ কাজ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও খুব কষ্ট হতে লাগল। এই প্রবল বাতাস অতিক্রম ক'রে আর অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য। শিপটন এমন মারাত্মক হাওয়ার মধ্যে পড়লেন যে, তাঁর জীবন রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠল। তাই তাঁরা নেমে আসা স্থির করলেন। ৩রা জুন সকলে এসে পোঁছলেন ৩নং তাঁবুতে। অধিনায়ক রাটলেজ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দলের আর কারোই নতুন ক'রে অভিযান করার শক্তি নেই। তাই তাঁরা সেখান থেকে রওনা হ'য়ে ৭ই জুন এসে পোঁছলেন বেস্-ক্যাম্পে। এখানে সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা আবার উঠে গিয়ে ৩নং তাঁবুতে জমায়েত হলেন, যদি পুনরায় চেষ্টা করা যায়—এই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। কিন্তু যতই তাঁরা ভালো আবহাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন আবহাওয়া ততই খারাপ হতে লাগল। অগত্যা সব পরিকল্পনা বাতিল ক'রে ২৩শে

জন তাঁরা ক্যাম্প খালি ক'রে সদলবলে নেমে এলেন। এ অভিযানও সফল হলো না।

এর পর বৎসর, ১৯৩৪ সালে, একটা অভিযান হয়—একে বলা যায় অভিনব অভিযান। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্ক মরিস উইলসন নামে এক ইংরেজ এই অভিযানে বের হলেন সম্পূর্ণ একাকী। এ'র ধারণা ছিল একাগ্রভাবে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করলে অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মার শোধন হয়। তিন সপ্তাহ অনাহারে থাকলেই হৃদয় পরিশুদ্ধ হ'য়ে যায় ব'লেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। মানুষের মন ও জীবন যদি এভাবে শোধন করা যায় তাহলে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে—উইলসনের মনে এই বিশ্বাস হয়। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তাঁর মতে দীক্ষিত করার জন্য উৎসাহী হ'য়ে ওঠেন। এবং পৃথিবীর দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার একমাত্র উপায়, উইলসন মনে করেন, এভারেস্টে পেঁছনো।

এরোপ্লেন চালানো বা পর্বত-আরোহণ কোনোটাই উইলসনের জানা ছিল না। তিনি ঠিক করলেন, একটা প্লেনে চ'ড়ে অনেক উঁচুতে উঠে এভারেস্টের চূড়ায় এরোপ্লেন সমেত নেমে পড়া, তারপর ঢালু-পথে পায়ে হেঁটে রংবুকে ফিরে আসাই সহজ কাজ। তাঁর মাথায় এইসব পাগলামি ঢোকে। তিনি এরোপ্লেন চালানো শিখে নিলেন; ছোট একটা উড়োজাহাজ কিনলেন; ভারতবর্ষে এলেন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার জন্যে। এখানে কর্তৃপক্ষ তাঁর পাগলামিতে বাধা দিলেন, এরোপ্লেন নিয়ে নিলেন। কিন্তু উইলসন বেপরোয়া। তিনি দারজিলিঙে গেলেন। এবং পায়ে হেঁটেই এভারেস্টে ওঠা সাব্যস্ত ক'রে বসলেন। দারজিলিঙ থেকে তিনি তিনজন শেরপা সংগ্রহ করলেন তাঁর সঙ্গীরূপে। নিজেকে তিনি একজন তিব্বতীর সাজে সাজালেন।

সিকিমের মধ্যে দিয়ে পথ হেঁটে তিনি তিব্বতের মালভূমিতে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে লামা খুব প্রীত হলেন। কেননা, উইলসনের মন যতই অপোক্ত হোক, তাঁর অভিযানের পদ্ধতি যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, তাঁর আদর্শটা ছিল খুব উঁচু।

এখানে বৌদ্ধমঠে শেরপাদের রেখে তিনি একাকী রওনা হলেন। সঙ্গে নিলেন মাত্র একটা তাঁবু ও সামান্য চাল। তিনি ১৯,৫০০ ফুট উপরে উঠে গেলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ায় এখানে তাঁকে পনের দিন বিশ্রাম করতে হয়। যাই হোক, এখান থেকে আবার তিনি যাত্রা করলেন, এবার সঙ্গে শেরপা নিলেন। ১৯৩৩ সালের অভিযাত্রী-দলের ৩নং ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে তিনি বিস্তর খাদ্যসামগ্রী পেলেন—এইগুলি অভিযাত্রীরা গত বছর এখানে পুঁতে রেখে গেছেন। এতে উইলসনের সুবিধেই হলো। শেরপারা নর্থ কল্ অভিমুখে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হলো না। কেমন করে বরফে পা রাখার জন্যে ধাপ কাটতে হয়, উইলসন তাও জানতেন না। তিনি শেরপাদের রেখে ৩নং ক্যাম্প ত্যাগ ক'রে একাই চললেন। তাঁর ধারণা ছিল গত বছরের অভিযাত্রীরা যেসব ধাপ কেটেছিলেন, তা বুঝি তেমনি আছে। কিন্তু তুষারপাতে সব ধাপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে দেখে তিনি হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তিনি অগত্যা ফিরে এলেন তাঁবুতে। শেরপারা তাঁর উপর বিরক্ত হ'য়ে তাঁকে ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছিল। এই ৩নং তাঁবু থেকে উইলসন প্রত্যহ একবার ক'রে অভিযানে বের হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে প্রত্যহ ফিরে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু তবু পরাজয় স্বীকার করতে তিনি রাজী ছিলেন না। হয় ঐশ্বরিক শক্তির উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিংবা পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার ক'রে বেঁচে থাকার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে সেইখানেই মারা যান।

পর বছরের, ১৯৩৫ সালের, অভিযাত্রী-দল উইলসনের যে ডায়েরি কুড়িয়ে পেয়েছেন—তাতে এইসব বিবরণ আছে।

এদিকে উইলসন তাঁর একক-অভিযানে রত, ওদিকে লণ্ডনে এভারেস্ট কমিটি নূতন অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত। বার কয়েক অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবার একটা পথ আবিষ্কারের বিষয় তাঁরা ভাবতে লাগলেন। মৌসুমী শুরু হবার আগেও যখন ভালো আবহাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মৌসুমী শেষ হবার পর কিংবা মৌসুমীর মধ্যেই উপযুক্ত আবহাওয়া পাওয়া সম্ভব কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করা আরম্ভ হলো। ১৯৩৫ সালের বসন্তকালে এক বছরের জন্যে অভিযানের অনুমতি যখন তিব্বতী গবর্নমেণ্ট দিলেন তখন এইসব বিষয় অনুসন্ধান করার সুযোগ উপস্থিত হলো। অনুমতি পেতে দেরি হওয়ায় বসন্ত-অভিযান আরম্ভের আর সময় পাওয়া গেল না। সেইজন্যে এভারেস্ট কমিটি শিপটনের উপর ভার দিলেন—মৌসুমী আবহাওয়ার মধ্যে হিমালয়ের তথ্য অনুসন্ধান করার জন্যে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো বারিপাতের মধ্যে বরফের অবস্থা জানা; সেই সঙ্গে পশ্চিম দিকের পথ দেখে নেওয়া এবং ১৯৩৬ সালের অভিযানের জন্যে লোকজন সংগ্রহ করা।

মে মাসের শেষের দিকে শিপটনের দল দারজিলিঙে জমায়েত হলেন। দলে ছিলেন এইচ ডবলিউ টিলম্যান, ডক্টর চার্লস ওয়ারেন, ই জি এইচ কেম্পসন, ই এইচ ডবলিউ ওয়াইগ্র্যাম, আর এল ভি ব্রায়াণ্ট। এখান থেকে পনেরজন শেরপা সংগ্রহ করাও হলো। এর আগের এক-একটা অভিযানে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ক'রে খরচ হয়েছে, শিপটন এবারের অভিযানের মোট ব্যয়বরাদ্দ করলেন মাত্র ২১ হাজার টাকা। সামান্য জিনিসপত্র ও অল্পসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে আরম্ভ হলো তাঁর অভিযান। তিব্বতে

এসে তাঁরা জানলেন যে, অভিযাত্রী-দলকে তিব্বত সরকার যে অনুমতি দিতে চান না, তার কারণ হলো এর দরুন এখানকার জনসাধারণের উপর কুপ্রভাব প'ড়ে থাকে। অভিযাত্রীরা বিস্তর টাকা খরচ করেন, এতে আকৃষ্ট হ'য়ে লোকজন চ'লে যায় এবং দেশের কৃষি ইত্যাদির কাজ এতে ব্যাহত হয়।

শিপটনের দল দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চললেন। ২৬শে জুন মৌসুমী হাওয়া শুরু হলো। তাঁরা ৪ঠা জুলাই রংবুকে এসে পোঁছলেন। তাঁরা এখান থেকে এগিয়ে ২নং তাঁবু গাড়লেন, তারপর ৮ই জুলাই এসে পোঁছলেন ৩নং তাঁবুতে। এখানে তাঁরা উইলসনের মৃতদেহটি পেলেন। ঝড়ে তাঁবু উড়ে গেছে। জিনিসপত্র তছনছ হয়েছে, কিন্তু দেহটি রয়েছে প'ড়ে। মনে হলো, ঘুমন্ত অবস্থায়ই যেন মারা গেছেন উইলসন। শিপটনের দল উইলসনের ডায়েরিটা সংগ্রহ ক'রে তাঁকে সমাধিস্থ করলেন।

১২ই জুলাই শিপটন নর্থ কল্‌এ তাঁবু ফেললেন। শিপটনের ইচ্ছে ছিল ২৬,০০০ ফুট উঁচুতে একটা এবং সম্ভব হলে, ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে আর একটা তাঁবু গাড়বেন; আর সেখান থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুর্যোগের আবহাওয়া শুরু হ'য়ে গেল। তাঁরা চারদিন এখানে অপেক্ষা করলেন, যদি আবহাওয়া ভালো হয়। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাই ১৬ই জুলাই তাঁরা নামতে আরম্ভ করলেন। সময়মত তাঁরা নামবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন ব'লে রক্ষে—তা না হলে দুরূহ সংকটে তাঁদের পড়তে হত। তাঁরা নিরাপদে এসে পোঁছলেন ৩নং ক্যাম্পে।

শিপটন বুঝলেন ২১,০০০ ফুটের উপরে মৌসুমী আবহাওয়ার অবস্থা জানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই তাঁদের দল অভিযানের চেষ্টা ত্যাগ ক'রে হিমালয় থেকে নেমে এলেন।

আ বা র অ ভি যা ন

ব্যর্থ হলো ১৯৩৫ সালের অভিযান।

উপর্যুপরি এই ব্যর্থতায় সকলের মনেই একটা নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছিল প্রথম দিকে, কিন্তু সে নৈরাশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। যতই দুর্লঙ্ঘ্য ব'লে মনে হয়েছে হিমালয়ের এই সর্বোচ্চ শিখরকে, মানুষের সঙ্কল্পও দিনে দিনে ঠিক ততখানিই দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। সঙ্কল্প যেখানে অদম্য, নৈরাশ্যের সেখানে স্থান নেই। বছর না ঘুরতেই তাই আর-একটি অভিযাত্রী-দল পাঠানো হলো।

নেতা নির্বাচিত হলেন হিউ রাটলেজ। দলে রইলেন স্মাইথ, শিপটন, হ্যারিস, কেম্পসন, ওয়ারেন, ওয়াইগ্র্যাম, অলিভার আর গ্যাভিন। শেষোক্ত জন অর্থাৎ গ্যাভিন এর আগে আর কখনো এভারেস্ট-অভিযানে আসেননি, তবে স্মাইথের সঙ্গে আল্‌প্‌স্‌ অভিযানে গিয়ে তিনি বেশ খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারই জন্যে তাঁকে দলভুক্ত করা হলো। আর অলিভার এর আগে একবার ত্রিশূল পর্বত অভিযানে এসেছিলেন। ১৯৩৬ সালের এই অভিযাত্রী দলের থেকে যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বাদ প'ড়ে গেলেন, তিনি হচ্ছেন টিলম্যান। ২৩ হাজার ফুট উঁচু জায়গার আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি নাকি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। সেই জন্যেই এবারে তাঁকে বর্জন করা হলো। কথাটা যে কতদূর অসার, নন্দাদেবী অভিযানে ২৫,৬৪৫ ফুট পর্যন্ত আরোহণ ক'রে টিলম্যান তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দিয়ে আর-তিনজন লোককেও ১৯৩৬ সালের অভিযানে গ্রহণ করা হলো। এ'রা

হচ্ছেন সি জে মরিস, ডব্লিউ আর স্মিথ-উইণ্ডহ্যাম এবং ডাঃ জি নোয়েল হাম্ফ্রিজ।

২৫শে এপ্রিল তারিখে এই দলটি যখন রংবুকে এসে পেঁীছলেন, চারদিকে তখন চমৎকার আবহাওয়া। তিব্বতীরা এই রংবুক উপত্যকাকে একটি পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য ক'রে থাকেন, পশুহত্যা এখানে নিষিদ্ধ। রংবুক থেকে এভারেস্টের স্পষ্ট একটা ছবি পাওয়া যায়। সে ছবি সৌন্দর্যে এতই মনোরম, এবং গাম্ভীর্যে এতই ভয়াবহ যে, সকলকেই তার সামনে এসে খানিক-ক্ষণের জন্যে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে থাকতে হয়। ম্যালরি এর একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'অন্যান্য আরও অনেক পর্বতচূড়া এখান থেকে দেখা যায়, তারাও কিছু কম উঁচু নয়। প্রত্যেকটিরই উচ্চতা ২৩ হাজার ফুট থেকে ২৬ হাজার ফুট হবে। কিন্তু সকলেই তারা এভারেস্টের কাঁধের নীচে প'ড়ে আছে, এভা-রেস্টের পাশে তাদের চোখেই পড়তে চায় না। এভারেস্ট তাদের সকলের উপরে তার অটল মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

রংবুকের সেই চমৎকার আবহাওয়া কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পালটে গেল। অভিযাত্রী দল যেদিন রংবুকে এসে পেঁীছলেন, এভারেস্টকে তখন আগাগোড়া কালো দেখাচ্ছে। সকলেই আশা করছেন যে, আবহাওয়া হয়তো আর এবারে তেমন কিছু বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করবে না। পরের দিনই তাঁরা মূল ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, অন্যান্য ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার কাজও এগুতে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের, ৩০শে এপ্রিল তারিখে বেতারে এসে খবর পেঁীছল, আবহাওয়ার গোলযোগ দেখা দিয়েছে। বিকেল থেকেই নীল আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল, তারপর রাত্রে তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সবাই বুঝতে পারলেন যে, এবারকার অভিযানও একটা অনির্দেশ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে চলেছে। যে এভা-

রেস্টকে এতক্ষণ আগাগোড়া কালো দেখাচ্ছিল, তারও সেই শান্ত চেহারা আঁর বেশীক্ষণ বজায় রইল না, দেখা গেল যে, ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গ একটা শাদা তুষারের আবরণে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে। অভিযাত্রী দলের আগ্রহ-উন্মুখ দৃষ্টির সামনে থেকে নিজেকে সে এক মৌনকঠিন রহস্যের অন্তরালে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তিন নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার দু-একদিন বাদেই শুরু হলো ভীষণ তুষারপাত। নর্থ কল্-এ পৌঁছবার রাস্তা তখনও তেমন-কিছু খারাপ হয়নি বটে, তবে ক্রমেই যে তা একটা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে চলেছে, তাও কারুর বুঝতে বাকী রইল না। এই অবস্থার মধ্যেই স্মাইথ আর শিপটন গিয়ে চার নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে তাঁদের পঞ্চাশজন শেরপা। শেরপাদের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেল, ২৭,৮০০ ফুট উঁচুতে উঠে গিয়ে তারা সাত নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু সে আশ্বাসে কেউ সাহস পেলেন না। এতই তুষারপাত হয়েছে যে, আর সামনে এগুনো অসম্ভব। আবহাওয়ার অবস্থাও রীতিমত সন্দেহজনক। ক্রমাগত পূর্বদিক থেকে হাওয়া বইছে, পশ্চিম থেকে হাওয়া বইবার লক্ষণ নেই। অভিযাত্রীরা আর সামনে না এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিন দিন কেটে গেল, তবুও কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না। এই অবস্থায় ১৯শে মে তারিখে স্মাইথ নীচের দিকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত করলেন। তাঁরা ফিরে আসবার পর রাটলেজ স্থির করলেন যে, গোটা দলটাকে ১নং ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ১নং তাঁবুতে প্রত্যাবর্তনের পরেই বেতারে একটা ভয়াবহ দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল, বর্ষা এসে পড়তে আর দেরি নেই। ২২শে মে খবর পাওয়া গেল, দারজিলিঙ পাহাড়ে বর্ষা নেমে গিয়েছে। পরের দিন থেকেই এভারেস্টের উপরে বর্ষাকালীন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। এবারকার

বর্ষা যে এত তাড়িৎগতিতে এসে পেঁছবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা হতাশ হলেন না। ২৪শে মে তারিখে মূল অভিযাত্রী দল সেই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে সামনে এগিয়ে গিয়ে তিন নম্বর ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার তাঁদের ১নং ক্যাম্পে ফিরে আসতে হলো।

১৯৩৬ সালের এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে অদৃষ্টের দেবতা বোধহয় একটু কৌতুক করছিলেন। ১ নম্বর ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, আবহাওয়া ফের অনুকূল হয়ে আসছে। একটু যেন আশ্বাস পেলেন সবাই, আবার সামনে এগিয়ে গিয়ে তিন নম্বর ক্যাম্পে এসে উঠলেন। স্থির করা হলো, অবিলম্বে তাঁদের কয়েকজন এবারে নর্থ কল্-এ আরোহণের জন্যে রওনা হয়ে যাবেন। কে কে যাবেন? যাবেন স্মাইথ, শিপটন, ওয়ারেন, ওয়াইগ্র্যাম, হ্যারিস আর কেম্পসন। সঙ্গে থাকবেন অভিজ্ঞ শেরপা অ্যাংথার্কে।

এখন এই নর্থ কল্ জায়গাটার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এভারেস্টের মূল শৃঙ্গের পাশে আরও দুটি শৃঙ্গ আছে। তিব্বতীরা এ-দুটি শৃঙ্গকে নাপসে এবং লোৎসে বলে থাকে। এই চূড়াগুলির থেকে উত্তরে আর দক্ষিণে বিরাট দুটি খাঁজ বেরিয়ে গিয়েছে। এদেরকেই বলা হয় নর্থ কল্ আর সাউথ কল্।

স্মাইথের ছোট দলটি যখন নর্থ কল্-এ আরোহণের জন্যে প্রস্তুত হলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তখন ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠছে। অবস্থা দেখে বোঝা গেল, যে কোনো মুহূর্তেই বরফ ধসা শুরু হ'য়ে যেতে পারে। আর তা হলেই সর্বনাশ। মূল অভিযাত্রী দলের কাছে ফিরে আসতে পারাটাই তখন একটা সমস্যা হ'য়ে দেখা দেবে। অথচ এ-ও তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এতখানি এগিয়ে যদি এখন

আবার ফিরে যান তাহলে নর্থ কল্-এ আরোহণের গোটা পরিকল্পনাটাকেই এবারকার মতো হয়তো বিসর্জন দিতে হ'তে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আর সামনে এগ্বতে সম্মত হলেন না। শিপটনও বললেন যে, অনর্থক আর বিপদের ঝ্বঁকি না নিয়ে সঙ্গীদের এবারে একটা নিরাপদ জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

পরের দিন সকাল থেকেই প্রবল তুষারঝঞ্ঝা শ্বর্ব হ'য়ে গেল। কিন্তু তার ভয়াবহ ভাবটা একট্ব কমে আসতেই শিপটন আর হ্যারিস রাটলেজের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, আর-একবার তাঁদের দ্বজনকে সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়া হোক। নর্থ কল্-এর ঢাল্ব অংশগ্বলির অবস্থাটা তাঁরা পর্যবেক্ষণ ক'রে আসবেন, সেই সঙ্গে দেখে আসবেন মালবাহী লোকদের জন্যে কোনো নিরাপদ রাস্তা খ্বঁজে পাওয়া যায় কিনা। রাটলেজ এতে সম্মতি দেবার পর তাঁরা আর কিছ্বমাত্র দেরি করলেন না। ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

শিপটন আর হ্যারিসকে এ যাত্রায় যে একবার কী-ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়েছিল, এভারেস্ট অভিযানের উপরে লেখা বিভিন্ন বইয়ে তার উল্লেখ রয়েছে। নর্থ কল্-এর কাছাকাছি গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, তার নীচের অংশের ঢাল্ব জায়গাগ্বলির অবস্থা তখন আগের চাইতে অনেক ভালো। দেখে তাঁদের আশা হলো, নর্থ কল্-এ আরোহণ হয়তো এবার অসম্ভব না-ও হ'তে পারে। কিছ্বক্ষণের চেষ্টাতেই তাঁরা পাঁচশো ফ্বট উপরে উঠে যেতে সক্ষম হলেন। পাহাড়ের গায়ে যে বরফ লেগে রয়েছে তা বেশ কঠিন, শিপটন আর হ্যারিসের জ্বতোর কাঁটা তাতে শক্তভাবে বি'ধে যাচ্ছে। স্বভাবতই তাঁদের মনে হলো, বরফের অবস্থা নিশ্চয়ই আরোহণের পক্ষে কোনো অস্ববিধে স্বৃষ্টি করবে না। সামনে শিপটন, পিছনে হ্যারিস। আরো ফুট

চল্লিশেক তাঁরা এগিয়েছেন, এমন সময় আকস্মিকভাবে একটা বিপদ ঘটল। বরফের গায়ে চিড় খেয়ে যাবার একটা শ্লথমন্থর শব্দ শুনে বিস্মিতভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, বিরাট একটা ধস্ নামছে। বরফের এই ধস্গুলি যে কি মারাত্মক, সকলেই জানেন। নিতান্ত ভাগ্যবলেই শিপটন আর হ্যারিস সেবারে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর তাঁরা কালক্ষেপ করেননি, সামনে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে তৎক্ষণাৎ দুজনে তিন নম্বর ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গেই যে নর্থ কল্-এর এই ঢালু জায়গাগুলি সব বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে, রাটলেজের আর তা বুঝতে বাকী রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই অভিযান প্রত্যাহার করা হলো। তবে ফিরে আসবার আগে স্মাইথ আর হ্যারিস রংবুক হিমবাহের থেকে জায়গা-গুলিকে একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ ক'রে নিলেন। নর্থ কল্-এর পশ্চিম দিককার অংশ সম্পর্কে তাঁরা বললেন, সেখান দিয়ে হয়তো একটা রাস্তা ক'রে নেওয়া যেতে পারে। বর্ষাকালে সে রাস্তা পুব-দিককার চাইতে নিরাপদ হবে।

•

ছত্রিশ সালের অভিযানও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কিন্তু কোনো কিছুই কি আসলে ব্যর্থ হয়? ব্যর্থতাকেই যদি সাফল্যের সোপান ব'লে ধরি তো এ কথা সবাইকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে, ব্যর্থ অভিযানের এই উপর্যুপরি প্রচেষ্টাই চূড়ান্ত সাফল্যের সোপান তৈরি ক'রে দিয়েছে। অভিযানের উদ্যোক্তারা তাই হতোদ্যম হলেন না, এক বছর বাদে ১৯৩৮ সালে আর একটি অভিযাত্রী দল পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ছত্রিশ সালে যিনি বাদ পড়েছিলেন সেই টিলম্যানকেই এবারকার এই অভিযানের নেতা নির্বাচন করা হলো।

টিলম্যান আদর্শ পর্বতারোহী। সাফল্য অর্জনের নেশায় কোনো দিন তিনি উন্মত্ত হ'য়ে ওঠেননি; নিছক পাহাড়ে চড়বার আনন্দলাভের জন্যই একটার পর একটা অভিযাত্রী দলে তিনি যোগ দিয়েছেন। এ নিয়ে সভাসমিতি ডেকে, কাগজে কাগজে বিবৃতি ছাপিয়ে সোরগোল তুলবার তিনি পক্ষপাতী নন, তাঁর মতে এ সব কাজ শান্ত সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যেই সমাধা হওয়া ভালো। প্রচার যন্ত্রটা তাঁর দু' চক্ষের বিষ, বিভিন্ন জায়গায় এর অপকারিতার কথা তিনি অকুণ্ঠভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'মাউণ্ট এভারেস্ট ১৯৩৮' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেন যে, নিসর্গদৃশ্যের মোহেই হোক আর অ্যাডভেঞ্চারের টানেই হোক—যে জন্যেই আমরা পাহাড়ে যাই না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু পাহাড়ে যাওয়া নিয়ে কাগজে কাগজে যখন হৈ চৈ প'ড়ে যায়, খাঁটি পর্বতারোহীমাত্রেই তখন একটু আতঙ্ক বোধ ক'রে থাকেন। তাঁর মতে, পর্বতারোহণের জন্যে যে মানসিক স্থৈর্যের প্রয়োজন, প্রচারকার্যের বাড়াবাড়িতে ক্রমেই সেটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

টিলম্যানকে যখন তাঁর সঙ্গী নির্বাচন ক'রে নিতে বলা হলো, মাত্র ছ'জনকে নিয়ে তিনি তাঁর দল গঠন করলেন। দলে ছিলেন এম এস স্মাইথ, ই ই শিপটন, এন ই ওডেল, সি বি এন ওয়ারেন, পিটার লয়েড এবং ক্যাপ্টেন পি আর অলিভার। এঁরা সব প্রখ্যাত পর্বতারোহী, এক পিটার লয়েডই শুধু নতুন। তবে আল্প্স্ পর্বতারোহণে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। দলে যে এত কম লোক নেওয়া হলো তার কারণ অভিযানের ব্যাপারে খুব বেশী অর্থব্যয়ের তখন কঠোর সমালোচনা চলছে।

৭ই এপ্রিল তারিখে অভিযাত্রী দল রংবুকে এসে পেঁছলেন। আগের বারের মতো এবারেও এভারেস্টকে সেখান থেকে আগাগোড়া কালো দেখাচ্ছিল। ২৬শে এপ্রিল তারিখে সবাই গিয়ে তিন নম্বর

ক্যাম্পে আশ্রয় নিলেন। নানান রকম বাধাবিঘ্নের ফলে তখনই অবশ্য নর্থ কল্-এ আরোহণের চেষ্টা করা সম্ভবপর হলো না; টিলম্যান ভেবে দেখলেন যে, বর্ষা শুরু হবার আগে আবহাওয়া যখন একটু শান্ত থাকে নর্থ কল্-এর উপরে অভিযান চালাবার ব্যাপারে সেইটেই সবচাইতে প্রশস্ত সময়। হাতে তখন প্রচুর সময় রয়েছে, অভিযান শুরু করবার আগে অভিযাত্রীদেরও একটু সুস্থ সমর্থ হ'য়ে নেওয়া দরকার। এপ্রিলের শেষাশেষি সঙ্গীদের নিয়ে তিনি তাই কিছুটা নীচে নেমে এলেন। ৫ই মে থেকে শুরু হলো তুষারপাত, সাত দিনের আগে তার বিরতি ঘটল না। অনন্যোপায় হ'য়ে ১৪ই মে তারিখে তাঁদের রংবুকে ফিরে আসতে হলো। সেখান থেকে দেখা গেল যে, আগের বারের মত এবারেও এভারেস্টের সর্বাঙ্গ শাদা তুষারের চাদরে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে।

১৮ই মে তারিখে টিলম্যান তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবার তিন নম্বর ক্যাম্পে এসে উঠলেন। পরের দিন বুঝলেন যে, অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। কিন্তু তারই মধ্যে ওডেল এবং অলিভার নর্থ কল্-এর ঢালু অংশ দিয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখে এলেন যে, বরফের অবস্থা ভালোই আছে, তার থেকে অন্তত তেমন কিছু বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নেই। স্থির করা হলো, পরের দিন অর্থাৎ ২০শে মে তারিখে তাঁরা নর্থ কল্-এর দিকে অগ্রসর হবেন। সেই রাত্রেই লয়েড অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, সকালে উঠে দেখা গেল তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। তাঁকে আর তাই সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হলো না। ওডেল, অলিভার, ওয়ারেন আর চারজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে টিলম্যান নর্থ কল্ অভিমুখে রওনা হলেন। এর পরে ৩০শে মে তারিখে টিলম্যান, ওয়ারেন আর ওডেল পরীক্ষামূলকভাবে একবার নর্থ রীজের দিকেও অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলেন। তুষার ঠেলে তাঁরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তার উচ্চতা ২৪,৫০০ ফুট হবে।

এ'দের এই অভিযানে নতুন এক ধরনের অক্সিজেন যন্ত্রের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছিল।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য কয়েকদিন বাদে সকলেই আবার এক নম্বর ক্যাম্পে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। এর পর আরও কয়েকবার তাঁরা সামনে এগিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ৫ই জুন তারিখে আবার তাঁরা চার নম্বর ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিলেন; শুধু তাই নয়, পরের দিনেই লয়েড, স্মাইথ আর শিপটনকে সঙ্গে নিয়ে টিলম্যান গিয়ে ২৫,৮০০ ফুট উঁচুতে তাঁদের পাঁচ নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলেন। পথে তাঁদের প্রবল তুষারঝঞ্ঝার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ হতোদ্যম হননি। স্মাইথ, শিপটন আর পাঁচজন শেরপাকে সেখানে রেখে বাকী সবাই নীচে নেমে এলেন।

বাতাসের তীব্রতার জন্যে পরের দিন সব কাজকর্ম বন্ধ রইল। তারপর ৮ই জুন তারিখে যেখানে গিয়ে তাঁরা ছ' নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করলেন, তার উচ্চতা হলো ২৭,২০০ ফুট। শেরপারা এ ব্যাপারে যে অতুলনীয় ধৈর্য এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল মুক্তকণ্ঠে সবাই তার প্রশংসা করেছেন। বস্তুত শেরপাদের সাহায্য ছাড়া সেই বিঘ্নভয়াল অবস্থার মধ্যে যে এ কাজ কোনো রকমেই সম্ভবপর হতো না, এ নিয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ নেই।

এত ক'রেও কিছু হলো না। স্মাইথ আর শিপটন সে রাত্রে ছ' নম্বর ক্যাম্পেই রইলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে দেখা গেল যে, আর সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একে তো অসম্ভব ঠাণ্ডা, তার উপরে তুষারের অবস্থাও রীতিমত বিপজ্জনক। বাধ্য হয়েই দু'জনকে তখন পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে ফিরে আসতে হলো। টিলম্যান বুঝলেন যে, ক্রমেই আবহাওয়া যেমন ভীষণ মূর্তি ধারণ করছে, তাতে আর শিখরে আরোহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সে

রকম কোনো চেষ্টা করলে তাতে করে শুধু সময় আর উৎসাহেরই অপব্যয় ঘটবে। তা ছাড়া এতে বিপদেরও আশঙ্কা রয়েছে। বুঝবামাত্রই তিনি অভিযান প্রত্যাহার ক'রে নিলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধকালে আর এভারেস্ট জয়ের জন্যে নতুন কোনো অভিযাত্রী দল প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও নানান অসুবিধের জন্যে বছর কয়েকের মতো অভিযান স্থগিত রাখতে হয়েছিল। ১৯৫১ সালের মে মাসে এভারেস্ট কমিটির কাছে এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো যে, সেই বছরেরই শরৎকালে যাতে একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলকে এভারেস্টে পাঠানো যায়, কমিটির থেকে তার জন্যে চেষ্টা করা হোক। এভারেস্ট কমিটি হচ্ছে রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি আর আলপাইন ক্লাবের একটি যুক্ত প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্বে এভারেস্টের উপরে যে সমস্ত অভিযান চালানো হয়েছে এ'রাই তা সংগঠন করেছেন। কমিটির কাছে যখন নতুন একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো ক্যাম্বেল, সেকর্ড এবং ডরু এইচ মারে তা সোৎসাহে সমর্থন করলেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতেও দেরি হলো না এবং অবিলম্বে অনুমতি পাওয়া যাবে এই আশায় মারেও তৎক্ষণাৎ অভিযান সংগঠনের কাজ শুরু করে দিলেন।

১৯৫১ সালের এই অভিযাত্রী দলের নেতা নির্বাচিত হলেন শিপটন। শিপটন এর আগে আরও কয়েকবার হিমালয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতো বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ লোক খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁকেই যে দলের নেতৃপদে বসানো হবে, এ তিনি ভাবতে পারেননি। তিনি তখন সবেমাত্র চীন থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরেছেন, এভারেস্ট অভিযানের জন্যে যে তোড়জোড় চলছে তিনি তা জানতেন

না। কী একটা কাজে একদিন লণ্ডনে এসেছিলেন, সেইখানে তাঁর সঙ্গে সেকর্ডের সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। সেকর্ড জানতেন না যে, তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। সে যাই হোক, শিপটনকে আর তিনি ছাড়লেন না। বললেন যে, তাঁকেই এই অভিযাত্রী দলের নেতৃপদ গ্রহণ করতে হবে। "অভিযাত্রী দল! কীসের অভিযাত্রী দল?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন শিপটন। ব্যাপারটা তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলা হলো। শিপটনও তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হ'য়ে পারলেন না।

কয়েক দিনের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল, অভিযাত্রী দল পাঠাবার ব্যাপারে নেপাল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তবে হাতে আর তখন সময় না থাকায় স্থির করা হলো যে, এবারকার এই দলটি গিয়ে শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে আসবেন। দলে রইলেন মাইকেল ওয়ার্ড, টম বুর্দিলো আর ডবলু এইচ মারে। পরে ই পি হিলারী এবং এইচ ই রিডিফোর্ডও নেপালে এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। মারে তাঁর 'স্টোরী অব্ এভারেস্ট' গ্রন্থের এক জায়গায় এই অভিযানের সম্পর্কে লিখছেন যে, চারটি প্রশ্নের তাঁরা উত্তর খুঁজছিলেন। প্রশ্ন চারটি হলো, (১) হিমপ্রপাতের মধ্য দিয়ে কোনো রাস্তা ক'রে নেওয়া যাবে কিনা; (২) সাউথ কল্-এর ঢালু অংশে কি আরোহণ করা সম্ভব হবে; (৩) দক্ষিণ-পূর্ব-দিককার শিখরটিকে ফটোতে যে রকম দেখা যাচ্ছে, সত্যিই কি সেটা ততখানি সুগম; (৪) শিখর আরোহণের ব্যাপারে কোন্‌টা ভালো সময়, বসন্ত না শরৎ? মারে বলছেন যে, এই চারটি প্রশ্নের প্রথম তিনটির উত্তর পেলেই এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'তে পারত।

এখন সংক্ষেপে মূল অভিযানের খবর বলছি। ২৩শে অগস্ট সবাই নেপালের যোগবাণীতে এসে পেঁছিলেন। সেইখান থেকেই অ্যাংথার্কে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। যোগবাণী থেকে নামচেবাজারে

এসে পৌঁছতে এই অভিযাত্রী দলটিকে মারাত্মক রকমের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। নামচেবাজারে দু' দিন কাটিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শেরপা সংগ্রহ ক'রে আবার এঁরা পথে নেমে পড়লেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে পুমোরি বলে একটা জায়গার কয়েক হাজার ফুট নীচে এঁদের মূল ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলো। সেখান থেকে হিমপ্রপাতের যে অবস্থা দেখা গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো পর্যবেক্ষণের কাজ। দলটিকে দুভাগে বিভক্ত ক'রে নিয়ে দুদিকে পাঠানো হলো। শিপটন, হিলারী এবং মারে গেলেন পুমোরির পূর্বদিকে, রিডিফোর্ড ওয়ার্ড আর বুর্দিলোকে হিমপ্রপাত পর্যবেক্ষণের কাজে পাঠানো হলো। পর্যবেক্ষণ শেষ ক'রে ক্যাম্পে ফিরে সবাই ঠিক করলেন যে, হিমপ্রপাতের আরও কাছে গিয়ে একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২রা অক্টোবর তারিখে শিপটন, হিলারী, রিডিফোর্ড আর বুর্দিলো লো-লার নীচে তাঁদের অগ্রবর্তী ক্যাম্পে গিয়ে উঠলেন।

৪ঠা অক্টোবর তারিখে অল্পের জন্যে রিডিফোর্ড একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। তাঁদের যাত্রাপথে বিরাট একটা বরফের চাঁই ধ'সে পড়েছিল। রিডিফোর্ড তাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতেন; শিপটন এবং পাসাং নামে একজন শেরপার উপস্থিত বুদ্ধির জন্যেই সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

এর পর কয়েকদিন ধরে হিমপ্রপাতের অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজ চলল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে অভিযাত্রী দল গিয়ে হিমপ্রপাতের নীচে পৌঁছলেন। সেখান থেকে খাড়া উপরে উঠতে হবে। তবে শক্ত বরফ পাওয়ায় আরোহণের পক্ষে খুব অসুবিধে হয়নি। উপরে উঠে দেখা গেল, সামনের দিকে বেশ খানিকটা দূরে আরো একটা হিমপ্রপাত রয়েছে। আকারে সেটি প্রথমটির মতই বিরাট, তবে

অতটা খাড়াই নয়। সেটি পার হ'য়ে যেতে পারলে কল্-এ গিয়ে পৌঁছবার একটা পথ ক'রে নেওয়া যাবে। কিন্তু অভিযাত্রীরা আর সামনে না এগিয়ে শিপটনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে পিছিয়ে এলেন।

শিপটন আর হিলারী তার কয়েকদিন আগেই তাঁদের পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ ক'রে এভারেস্টে ফিরে এসেছেন। সরাসরি হিমপ্রপাতের নীচে গিয়ে সেখানে তাঁরা একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে সবাই মিলে আবার হিমপ্রপাতের শীর্ষে গিয়ে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন অ্যাংথার্কে, পাসাং আর নীমা। গিয়ে দেখা গেল যে, বরফ ধ'সে গিয়ে সেখানে মারাত্মক সব গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। শিপটনের কাছে আগেই এর খবর তাঁরা পেয়েছিলেন। দড়ির সাহায্যে সেই গহ্বর পার হ'য়ে যেতে অবশ্য অভিযাত্রীদের কষ্ট হলো না। তবে বোঝা গেল যে, হিমপ্রপাতের অবস্থা যদি এই রকমই থাকে, তবে উঁচুতে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়মিতভাবে সেখানে দরকারী জিনিসপত্র পাঠাতে তাঁদের অত্যন্তই অসুবিধেয় পড়তে হবে।

এ যাত্রায় তাঁরা আর খুব বেশী সামনে এগুতে পারেননি। একটু এগিয়েই সবাই দেখতে পেলেন যে, তাঁরা ভুল পথে এসেছেন। দুদিক দিয়েই সামনে যাবার পথ রুদ্ধ। বাধ্য হ'য়ে তাঁরা ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

ফিরে এসে তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, সামনের বছর আরএকটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করা সঙ্গত হবে কিনা। হিমপ্রপাতের যে অবস্থা তাঁরা দেখে এসেছেন, তাতে সরবরাহের কাজ অত্যন্তই বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। তবে ইতিমধ্যে যদি একটা শীতকাল কেটে যায় তো বরফ প'ড়ে প'ড়ে আবার নতুন কোনো পথের সৃষ্টি হ'তে

পারে। যে বিরাট গহ্বর এখন তাঁদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, উপর থেকে হিমবাহের অগ্রগতির ফলে সেটার দুর্লঙ্ঘ্যতা ঘুচে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া এ বছর যে সমস্ত অসুবিধে দেখা দিয়েছে, আগামী বছরও যে সেই একই অসুবিধে দেখা দেবে, তাও কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না। ভেবেচিন্তে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, পরবর্তী বছরে আর-একটি অভিযাত্রী দল পাঠানোই সঙ্গত।

সে দলটিকে কোন্ সময়ে পাঠানো হবে। এপ্রিলে-মে মাসে, না বসন্তকালে? বসন্তকালে আবহাওয়া প্রায়ই মারমূর্তি নিয়ে দেখা দেয়। এভারেস্ট শিখরের কাছাকাছি পৌঁছে তখন দিন দুয়েকের বেশী ভালো আবহাওয়া পাওয়া যায় না। সে হিসেবে এপ্রিল-মে-ই সবচাইতে প্রশস্ত সময়। অভিযাত্রীদের মধ্যে অবশ্য এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

সে যাই হোক, আপাতত আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অক্টোবরের শেষের দিকে সবাই ফিরতি-পথে রওনা হলেন, ১লা নভেম্বর তাঁরা নামচেবাজারে এসে পৌঁছলেন। আসবার আগে ওয়ার্ড আর বুর্দিলো লো-লার কাছ থেকে হিমপ্রপাতের দক্ষিণ-দিককার অবস্থাটা বেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে এসেছিলেন।

স্নোম্যান বা তুষারমানবের কথা সকলেই কিছু-না-কিছু শুনেছেন। এবারকার এই অভিযানকালে তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের উপরে প্রায় দীর্ঘ দু' মাইল পথ ধ'রে তার রহস্যময় পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। পরে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৯৫১ সালের অভিযাত্রী দলের উপর যে অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল সে কাজ তাঁরা ভালভাবেই সম্পন্ন ক'রে এলেন।

পথঘাট এবং আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে নতুন নতুন-অনেক তথ্য জানা গেল। এভারেস্ট কমিটি স্থির করলেন যে, তাঁদের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যাতে এভারেস্ট শৃঙ্গের উপরে দ্রুত আর-একবার অভিযান চালানো যায়, তার জন্যে ১৯৫২ সালেই তাঁরা আর একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল প্রেরণ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ১৯৫২ সালে অভিযান পরিচালনার জন্যে 'সুইস ফাউণ্ডেশন ফর্ আলপাইন রিসার্চ' তাঁদের অনেক আগে থেকেই অনুমতি প্রার্থনা ক'রে রেখেছেন। দুই পক্ষের মধ্যে কোনো রেষা-রেষি নেই, তাই একটি যুক্ত অভিযান চালাবার জন্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভবও হতো হয়তো, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নেতা নির্বাচন নিয়ে। সমস্যার কোনো সমাধান যখন সম্ভব হলো না, তখন স্থির করা হলো, ১৯৫২ সালে সুইস অভিযাত্রী দল একবার এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা ক'রে আসবেন। তাঁরা যদি ব্যর্থ হন তো ১৯৫৩ সালে একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলকে হিমালয়ের এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করতে পাঠানো হবে।

সুইস অভিযাত্রী দলে মোট এগারোজন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে আটজন পর্বতারোহী, তিনজন বৈজ্ঞানিক। পর্বতারোহীদের নাম রেনে দিতেয়ার, আঁদ্রে রক্, রেমণ্ড ল্যাম্বেয়ার, ডাঃ গ্যাব্রিয়েল শেভ্যালী, রেনে অবেয়ার, লিয়' ফ্লোরী, জাঁ-জ্যাকস্ অ্যাসপার এবং আর্নেস্ট্ হফ্স্টেটার। তেনজিং শেরপাকেও এঁরা দলে পেয়েছিলেন। ডাঃ উইস্ডুরাণ্টের নেতৃত্বে ২৯শে মার্চ তারিখে এঁরা কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা করলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে নামচেবাজারে পৌঁছে এক শো পঁচাত্তরজন শেরপাকে দলে নেওয়া হলো। মূল ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলো ২০শে এপ্রিল তারিখে। জায়গাটা খুম্বু হিমবাহের পাশে, ১৬,৬০০ ফুট উঁচু।

দিতেয়ার, অবেয়ার, হফ্স্টেটার আর ল্যাম্বেয়ার এর পর কিছু-

সংখ্যক শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ১৭,২০০ ফুট উঁচুতে তাঁদের এক নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলেন। দু' নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হলো হিমপ্রপাতের মাঝামাঝি জায়গায়। রক্, ফ্লোরী, অ্যাসপার আর হফ্স্টেটার এর পর আরও খানিকটা সামনে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পথ না পাওয়ায় তাঁদেরকে ফিরে আসতে হয়। দিতেয়ার, ল্যাম্বেয়ার, অবেয়ার, শেভ্যালী এবং ন'জন শেরপার অক্লান্ত চেষ্টায় ৬ই মে তারিখে তিন নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলো। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁরা ২১,১৫০ ফুট উঁচুতে উঠে এসে চার নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করলেন। কিন্তু সাউথ কল্-এর ঢালু অংশের থেকে তখনও তাঁরা অনেক দূরে রয়েছেন। অবিলম্বে তাই আরো খানিকটা এগিয়ে পাঁচ নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া হলো। এ ক্যাম্পটি যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হলো, সেখানকার উচ্চতা প্রায় ২৩ হাজার ফুট। আবহাওয়া তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনুকূল, হঠাৎ যে বর্ষা নামবে এমন আশঙ্কা করবার কোনো কারণ নেই। ২৪শে মে তারিখে দিতেয়ার স্থির করলেন যে, চূড়ান্ত অভিযান এবারে শুরু করা যেতে পারে, আর বেশী দেরি করাটা ঠিক হবে না। কে কে যাবেন এই অভিযানে তাও স্থির করা হলো। যাবেন ল্যাম্বেয়ার, ফ্লোরী আর অবেয়ার। প্রথমত তাঁদের সাউথ কল্-এর উপরে গিয়ে একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর সেখান থেকে আরো খানিকটা এগিয়ে অন্তত ২৭,৫০০ ফুট উঁচুতে উঠে তাঁরা সাত নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করবেন। এ-কাজ তাঁদের একার পক্ষে সম্ভব নয়, সাতজন দক্ষ শেরপাকে তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হলো। এঁরা হলেন তেনজিং, পাসাং, আরজিবা, নীগমা দোরজে, আং নরবু, ফু থারকে আর দা নামগাল। সেইদিনই সকাল বেলা এঁরা যাত্রা করলেন বটে, কিন্তু আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ায় তাঁদেরকে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসতে হলো। পরের দিন তাঁরা ২৫,৩০০ ফুট উঁচুতে

গিয়ে উঠলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সবাই তখন অবসন্ন। একমাত্র তেনজিংই শুধু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েননি। স্লিপিং ব্যাগটাকে খুলে নেবার মত সামর্থ্যটুকুও যখন কারুর নেই, সেই সময়েও তিনি রীতিমত শক্ত-সমর্থ রয়েছেন। নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে তিনি তাঁর সঙ্গীদের সে-রাত্রে পরিবেশণ করেছিলেন।

পরের দিন ২৬,০০০ ফুট। সাউথ কল্ ছাড়িয়ে তাঁরা আরো উঁচুতে উঠে এসেছেন। সে রাত্রে সবাই পরিপূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

২৭শে মে সকাল থেকেই আবার যাত্রারম্ভ। সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই ইতিমধ্যে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, অনেকেই নীচের ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছেন। দলে তখন চারজন মাত্র লোক—ল্যাম্বেয়ার, তেনজিং, ফ্লোরী আর অবেয়ার। তেনজিং তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। ২৭,৫৫০ ফুট উঁচুতে এসে তিনি প্রস্তাব করলেন, সেইখানেই সে রাত্রের মতো ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হোক। পর্বতশীর্ষের ধু-ধু শাদা তুষারের মধ্যে রক্ত-জমিয়ে দেওয়া কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় কীভাবে সেই শীতমূর্ছিত রাত্রিটা তাঁদের অতিবাহিত হয়েছিল, ল্যাম্বেয়ার তার একটা ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। সঙ্গে একটা স্লিপিং ব্যাগ ছিল, অবেয়ারের অসতর্কতায় সেটা হাত-ফস্‌কে নীচে প'ড়ে গেছে; না আছে একটা মাদুর, না আছে স্টোভ। মোমবাতির আগুনে বরফ গলিয়ে নিয়ে তাঁদের সেদিন পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ল্যাম্বেয়ার বলছেন, 'একমাত্র শীতের ঠান্ডা হাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু খাদ্য আমাদের সঙ্গে নেই তখন।' ফ্লোরী আর অবেয়ার তবু সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ, তাঁরাও একটু আগে সাউথ কল্-এ ফিরে গিয়েছেন; রয়েছেন শুধু ল্যাম্বেয়ার আর তেনজিং। শরীর যাতে জমে না যায়, পরস্পরের সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে সে-রাত্রে তাঁদের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হয়েছিল।

তেনজিং আর ল্যাম্বেয়ার এ যাত্রায় ২৮,২১৫ ফ‍ুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। আর এক হাজার ফ‍ুটেরও ব্যবধান নয়, তার পরেই এভারেস্ট-শীর্ষ। কিন্তু দ‍ুর্ভাগ্য তাঁদের, অক্সিজেন-যন্ত্রে হঠাৎ গোলযোগ দেখা দিল। ল্যাম্বেয়ারের পক্ষে আর ওঠা সম্ভব হলো না, তেনজিংকে ফিরে আসতে হলো। অনেকের ধারণা, একা তেনজিংকে যেতে দেওয়া হ'লে সেবারেই তিনি এভারেস্ট জয় করতে পারতেন। স‍ুইস অভিযাত্রী দলের ফিরতি-পথে আর বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ম‍ূল ক্যাম্পে এসে পেঁাছবার তিনদিন বাদে এঁরা নামচেবাজারে ফিরে আসেন।

বছরের শেষ দিকে 'স‍ুইস ফাউণ্ডেশন' আর একটি দলকে এভারেস্ট জয় করতে পাঠালেন। দলের নেতৃপদে নিয‍ুক্ত হলেন ডাঃ গ্যাব্রিয়েল শেভ্যালী। তাঁর সঙ্গী হলেন রেমণ্ড ল্যাম্বেয়ার, জাঁ ব‍ুজিয়ো, আর্নস্ট রীস্, গ‍ুস্তাভ গ্রস্ এবং আর্থার স্পোহেল। পরে অধ্যাপক দাইরেনফার্থও এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আগের বারে তেনজিং নোরকে যে অতুলনীয় মনোবলের এবং অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে আর কার‍ুর ব‍ুঝতে বাকী ছিল না যে, এভারেস্ট অভিযানে তিনি অপরিহার্য। এবারেও তাঁকে সঙ্গে নেওয়া হলো।

১০ই সেপ্টেম্বর তাঁরা কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা হন। ২রা অক্টোবর রওনা হলেন নামচেবাজার থেকে খ‍ুম্ব‍ু হিমবাহের দিকে। এর পর কয়েকদিনের মধ্যেই হিমপ্রপাতের নীচে ১৭,২২৫ ফ‍ুট উঁচুতে তাঁদের ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলো। ২৬শে অক্টোবর যখন লোৎসে হিমবাহের তলায় তাঁদের পাঁচ নম্বর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হলো, দলের সবাই ততদিনে আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

পর্বতারোহণের পক্ষে মে মাসের চাইতে অক্টোবর মাসটা স‍ুইস

অভিযাত্রীদের কাছে একটু কম ক্লান্তিকর ব'লে মনে হ'লেও আরেক দিক থেকে একটা বড় রকমের বিঘ্ন দেখা দিল। অবিশ্রান্তভাবে বরফের ধস নামছে, প্রতি পদেই সতর্ক হ'য়ে চলতে হয়। আলগা এই বরফকে বলে খুনী বরফ, একটু অসাবধান হ'লেই এর হাতে মৃত্যু অনিবার্য। সে মৃত্যু এলও। শেভ্যালী তার হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচে গেলেন, নীগমা দোরজে অব্যাহতি পেলেন না। উপর থেকে বিরাট একখণ্ড বরফের চাঙড় তাঁর বুকের উপরে এসে আছড়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তিনি মারা গেলেন। নামচেবাজারের এই তরুণ শেরপার দুঃসাহসিক কর্মদক্ষতার কথা সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পাহাড়ের টানে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, পাহাড়ের উপরেই তাঁর অন্তিমশয্যা রচিত হলো।

সুইস অভিযাত্রী দল এর পর আর একটি দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নের সম্মুখীন হলেন, বাতাসের প্রচণ্ড তীব্রতা। ২৬,৫৭৫ ফুটের পরে তাঁরা আর সামনে যেতে পারলেন না। দু-এক দিনের মধ্যেই অভিযান প্রত্যাহার করা হলো। এবারকার এই অভিযানেও তেনজিং নোরকে যে অতুলনীয় মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছে, বছরখানেক আগে একটি সোভিয়েট অভিযাত্রী দল নাকি তিব্বতের দিক থেকে এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। খবরটি দিচ্ছেন সুইডিশ পর্বতারোহী এনডার্স বলিন্দর। সোভিয়েট দলের সঙ্গে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তাঁরা লাসায় ফিরে এসে জানান যে, দু'জন পর্বতারোহীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে অনেক অনুসন্ধান ক'রেও কোনো ফল হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে, পথেই তাঁদের জীবনান্ত হয়েছে।

তুষার-মানব

এভারেস্ট অভিযানের শেষ পর্যায়ে একটা ব্যাপার নিয়ে সভ্য-জগতে খুব সোরগোল প'ড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা আর অন্য কিছু নয়, তুষার-মানবের পদচিহ্ন। অভিযাত্রীরা সেই রহস্যময় পায়ের ছাপের ছবি তুলে নিয়ে এলেন। কাগজে কাগজে সেই ছবি, আর তার সঙ্গে প্রচুর প্রবন্ধাদিও ছাপা হলো। তুষার-মানব সম্পর্কে তখন এক-আধটা গালগল্পে যোগ দেননি, এমন মানুষ কেউ আছেন কিনা জানিনে। ট্রামে-বাসে, স্কুল-কলেজে, অফিসে-কাছাড়িতে এইটেই তখন সব-চাইতে জোর খবর। বিশেষ করে এরিক শিপটনের গোটাকতক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর উত্তেজনাটা যেন আরও বেড়ে গেল। কার এই পায়ের চিহ্ন, কে সে? অভিযাত্রীরা কেউ তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি, নিছক অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই তাঁদেরকে মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে।

এরিক শিপটনের অভিজ্ঞতার কথাই আগে বলা যাক। ১৯৫১ সালে ১৯ হাজার ফুট উঁচুতে মিনলাং বেসিনের এক হিমবাহের উপর তিনি এই পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে মাইল খানেকের বেশী তিনি এগুতে পারেননি। এর আগেও কয়েকবার এই ধরনের রহস্যময় পায়ের ছাপ তিনি দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই শেষ পর্যন্ত তা অস্পষ্ট হ'য়ে মিলিয়ে গিয়েছে। এবারকার চিহ্নগুলিকে কিন্তু প্রায় অবিকৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল; মনে হলো, এ-পদচিহ্ন যারই হোক না কেন, এ-পথ দিয়ে সে চলে যাবার পর চব্বিশ ঘণ্টাও অতিক্রান্ত হয়নি। এ বিষয়ে তেনজিংকে জিজ্ঞেস ক'রে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এগুলি হলো 'ইয়েতি'র পায়ের ছাপ। থিয়াংবোচিতে একবার নাকি তিনি এক লহমার জন্যে এই অদ্ভুত জীবটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তেনজিং তঁাকে আরো জানালেন যে, এই 'ইয়েতি' হলো অর্ধপশু-অর্ধমানব, উঁচুতে প্রায়

এভারেস্ট আরোহণের পথে অভিযাত্রী ম্যালরি ও নর্টন
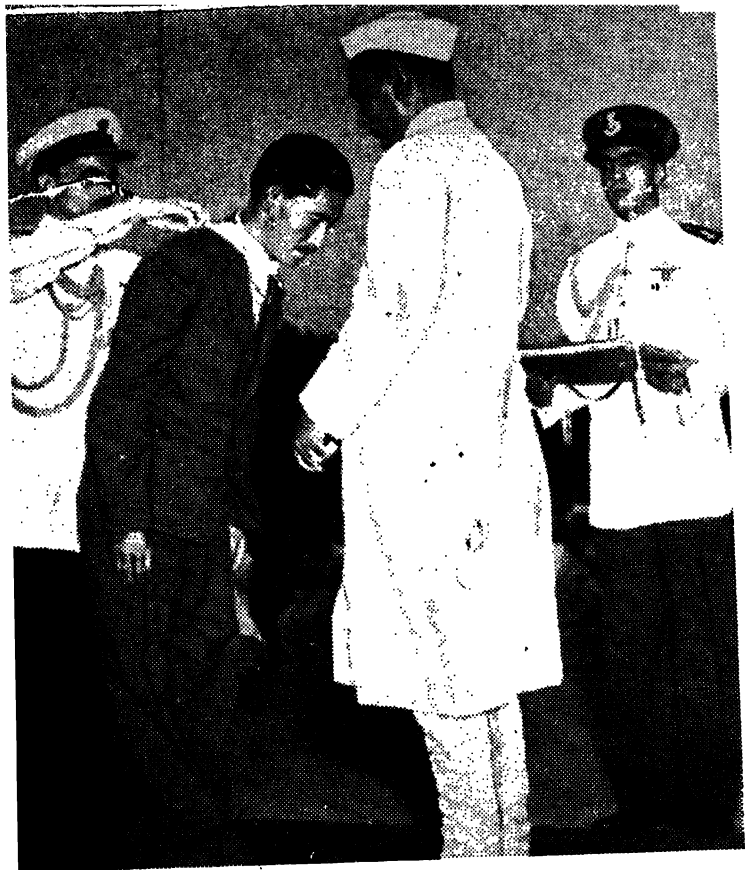
তেনজিং-এর সঙ্গে দুই কন্যা নীমা ও পেমপেম, মধ্যে
স্ত্রী আংলাহ্‌মুর কোলে তেনজিং-এর প্রিয় কুকুর 'খাংগার'

বাঁদিকে : (উপরে) ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এভারেস্ট বিজয়ী
তেনজিংকে সম্মানপদক উপহার

(নীচে) ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে হিলারী, হাণ্ট

বরফের ওপর তুষার মানবের পদচিহ্ন। পাশে বরফ কাটার কুড়ুল

কুশী নদীর তীরে ১৯৫৩ সালের অভিযাত্রী দল

সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। সারা দেহ লালচে লোমে ঢাকা, তবে মুখে লোম নেই। তুষার-মানব সম্পর্কে অনেকে রায় দিয়েছেন যে, এগুলি আসলে ভালুক অথবা বাঁদর। তেনজিং সে কথা মেনে নিতে সম্মত নন।

ভালুক অথবা বাঁদর হোক, কি অর্ধপশু-অর্ধমানব কোনো জন্তুই হোক, অ-দৃষ্ট এই তুষার-মানব যে সকলের মধ্যেই বেশ খানিকটা কৌতূহলের সঞ্চার করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকে আবার আশা করেছিলেন যে, এভারেস্ট জয়ের পর হয়তো এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট খবর পাওয়া যাবে। এভারেস্ট জয় সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তুষার-মানব সম্পর্কে তেমন কিছু খবর এখনও পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি খবর এসেছে যে, তুষার-মানব সংক্রান্ত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য লণ্ডনের 'ডেলী মেল' পত্রিকার উদ্যোগে ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে হিমালয়ে একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করা হবে। ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাসকে এই দলে গ্রহণ করা হয়েছে।

একটা কথা এখানে জানানো দরকার। রহস্যময় এই পায়ের ছাপ নিয়ে হালে খানিকটা সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। হাওয়ার্ড-বেরির নেতৃত্বে সর্বপ্রথম যে দলটিকে এভারেস্ট জয়ের জন্যে পাঠানো হয়, তাঁরাও সেবারে এই ধরনের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিব্বতী মালবাহীরা তাঁদের জানিয়েছিল যে, এগুলো হলো 'শুকপা'র পদচিহ্ন। আরো জানিয়েছিল যে, এই 'শুকপা' হচ্ছে দৈত্যসদৃশ প্রাণী, লম্বায় তারা বারো ফুট পর্যন্ত হয়। এর কিছুকাল বাদে আর একটি অভিযাত্রী দলও রংবুকে এসে শুনতে পেলেন, আগেকার অভিযাত্রী দলের পরিত্যক্ত তাঁবুতে এখন তুষার-মানবেরা এসে ডেরা বেঁধেছে। খবর শুনে তাঁদের মালবাহীরা সব ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কেউই

আর এগোতে চায় না। অনেক বুঝিয়ে তাদের শান্ত করা হয়। রোয়েরিকের একখানা গ্রন্থেও তুষার-মানবের সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি সেখানে বলছেন যে, ব্রিটিশ বাহিনীর এক মেজর নাকি একবার হিমালয়ে এসে অদ্ভুত লম্বা একটি প্রাণী দেখেছিলেন। দেখতে মানুষের মতো, তবে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ১৯২২ সালের অভিযাত্রী দলের নেতা জেনারেল চার্লস ব্রুসও রংবুকের লামাকে এই অদ্ভুত জীবের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। লামা তাতে নির্বিকার ঠাণ্ডা গলায় তাঁকে জানান যে, রংবুক আর তার হিমবাহে এই ধরনের পাঁচটি অর্ধমানব রয়েছে।

লামা নির্বিকার ছিলেন; পাঁচ-পাঁচটি অর্ধমানবের সান্নিধ্যে থেকেও তাঁর মানসিক স্থৈর্যের কোনো বিকার ঘটেনি। আধুনিক যুগের মানুষ কিন্তু নির্বিকার থাকতে পারছে না। এ-রহস্যের একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। কিন্তু সব রহস্যেরই কি সমাধান হ'য়ে যাওয়া ভালো? জীবন কি তাহলে বড্ড বেশী নীরস হ'য়ে উঠবে না?

করব না হয় মরব

সেই রাত্রে, এভারেস্ট বিজয়ের আগের রাত্রিটাতে (২৮শে মে ১৯৫৩), ওঁদের দ্দুজনের ভালো ঘ্দুম হয়নি। তেনজিং ঘ্দুমতে চেষ্টা করছিলেন বার বার। কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তি, দারুণ অস্থিরতা। ওঁর সমস্ত দেহটা কে যেন প্রাণপণে চিবুচ্ছিল। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল, বিরাট বলশালী একজন কেউ তাঁর ব্দুকে জাঁতা দিয়ে বসেছে. কঠিন থাবা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরেছে, এই ব্দুঝি দম বন্ধ হ'য়ে এল। এখন আর কোনও কিছ্দুর নয়, দরকার শ্দুধ্দু অক্সিজেনের। কিন্তু সঙ্গে যে অক্সিজেন আছে তা খ্দুবই পরিমিত। এখনই তা থেকে খরচ করতে দ্বিধা হলো।

হিলারী স্টোভ জ্বালালেন। জেবলে কফি বানালেন। গরম কফি পেটে পড়তে শরীর কিছ্দুটা চাঙ্গা হলো। তারপরে 'স্দুপ্' তৈরি হলো, মাছ রান্না হলো, বিস্কুট চকোলেট সহযোগে সেই রাত্রের খাওয়াটা মন্দ জমল না। তব্দু অস্বস্তি কাটল না। তখন তেনজিং আর হিলারী পরামর্শ করলেন, আর কৃপণতা ক'রে কি হবে, অক্সিজেন খানিকটা ক'রে নেওয়া যাক। ওঁরা তারপর প্রায় দ্দুঘণ্টা অক্সিজেন নিলেন। স্দুফল ফলল। ক্লান্তির দর্দুণ যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তা দ্দূর হলো। রাত্রি দ্দুটো পর্যন্ত মোটাম্দুটি নির্দুদ্বেগেই ঘ্দুম দিলেন। তারপর আর ঘ্দুমতে পারেন নি। আবার সেই নিদারুণ অস্বস্তি, তেমনি অস্থিরতা।

আমরা যারা সমতলবাসী, কেউই কল্পনা করতে পারব না, ২৮০০০ ফুটের ওপরে উঠবার পর কেমন অবস্থা হ'তে পারে লোকের। দ্দুর্দান্ত হাড়কাটা ঠাণ্ডার কথা ছেড়েই দিলাম। সেখানে বাতাস খ্দুব পাতলা, খ্দুব হাল্কা। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও

খুব কম। এত কম যে কলকাতার কোনও লোককে যদি এক হ্যাঁচকা টানে সেখানে নিয়ে ফেলা যায় তো তৎক্ষণাৎ সে দম আটকে ম'রে যাবে। তার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপও খুব ক্ষীণ। বাতাস যত পাতলা হয় দেহের ওজন তত বেড়ে যায়। সেখানে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নাড়াচাড়া করা ভয়ানক কষ্টসাধ্য। পা তো আর পা নয়, যেন পাথরের থাম। হাত দুখানা যেন সীসে দিয়ে তৈরি। হাতের দস্তানা খুলতে যাওয়া দূরে থাক, ঘড়িটার দিকে চেয়ে যে সময় দেখবে, তাতেই প্রাণান্ত। বরফ কাটার হাল্কা কুড়ুলটা তুলতে বুক যেন ফেটে যায় আর কি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের সেটা শেষ পর্ব। তাই প্রকৃতির যত শক্তি-সামর্থ্য, যত কৌশল আছে, সব জড়ো করেছে সেখানে। সব নিয়ে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছে মানুষের দুর্বার গতিকে, খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে মানুষের দুর্জয় শক্তিকে। সে যে কী ভীষণ সংগ্রাম কেউ কল্পনা করতে পারে না।

অস্বস্তি শুধু যে দেহে তা নয়, মনেও সেখানে উদ্বেগ দেখা দেয়। চিন্তাশক্তি নির্জীব হ'য়ে পড়ে, অসাড় হ'য়ে আসে বুদ্ধি। একটানা অনেকক্ষণ কোনো কিছু ভাবা যায় না, টুকরো-টুকরো ছাড়া-ছাড়া ঘটনা মনে আসে, আবার মুছে যায়। তেনজিং মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছিলেন। একই তাঁবুর মধ্যে তিনি আর হিলারী। হিলারী পাশে শুয়ে আছেন। এই প্রথম ওঁরা এক তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এতদিন পর্যন্ত তেনজিং-এর তাঁবু সাহেবদের থেকে আলাদা ছিল। এই নয় নম্বর শিবিরে তাঁরা একই তাঁবুর মধ্যে রাত কাটালেন। এই ব্রিটিশ সাহেবদের ব্যবহার তেনজিং-এর কাছে বড় অদ্ভুত লাগে। এরা বড় বেশী কেতাদুরস্ত। তেনজিং-এর মনে পড়ল গতবারের সুইস্ দলের সঙ্গে অভিযানের কথা। তারা তাঁকে কত আপন ক'রে নিয়েছিল। সুইস্ সাহেবরা তাঁর সঙ্গে আলাদা কোনো ব্যবহার

করেনি। বিশেষ ক'রে এই নয় নম্বর শিবিরটায় শ্বয়ে তাঁর মনে পড়ছিল ল্যাম্বেয়ারকে। গতবার ল্যাম্বেয়ারের সঙ্গে এসে এইখানেই তাঁরা তাঁব্ব গেড়েছিলেন। তখনই তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বারান্তরে যদি আসি, এইখানেই শিবির তুলব। জায়গাটা ২৭০০০ ফ্বট উঁচুতে।

তেনজিং শেষ পর্যন্ত আবার এলেন সেখানে। তবে এবারে সঙ্গে সেই অকৃত্রিম বন্ধ্ব ল্যাম্বেয়ার নেই, আছেন নতুন এক অভিযাত্রী, হিলারী। বেচারা ল্যাম্বেয়ার! ৭০০ ফুটের জন্য মার খেয়ে গেল!

তেনজিং ঘ্বমের আশা ছেড়ে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। স্টোভ জ্বালিয়ে বরফ গলাতে শ্বর্ব করলেন। বরফ ফুটিয়ে জল তৈরি হলো। সেই জল দিয়ে তৈরি হলো লেমন জ্বস্। তিনি ও হিলারী এক কাপ এক কাপ লেমন জ্বস্ খেলেন। তারপর আরো খানিকটা বরফ গলিয়ে বোতলে ভ'রে নিলেন। পাহাড়ে চড়বার সময় তেষ্টা পাবে।

তেনজিং আর হিলারী দ্বজনেই শ্বয়েছিলেন দ্বটো বড় ব্যাগের মধ্যে। 'ঘ্বমবার ব্যাগ'গ্বলো বিশেষভাবে তৈরি। হাজার ঠাণ্ডাতেও সে ব্যাগে হিম লাগে না। ব্যাগের মধ্যে শ্বয়ে শ্বয়েই তেনজিং কাজগ্বলো সেরে রাখলেন। যাত্রার সময় যেন আর ওসবের জন্য দেরি না হয়।

তেনজিং-এর অভিজ্ঞতা বেশী। তিনি জ্বতো জামা প'রেই ঘ্বমবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকেছিলেন। হিলারী তা করেন নি। তিনি জ্বতো জোড়া খ্বলে রেখে শ্বয়েছিলেন।

তেনজিং উঠে পড়লেন। কফি আর লেমনজ্বস্ তৈরি করে খেলেন, হিলারীকেও দিলেন। তারপর হিলারীকে বললেন, 'এবার তাহলে এগ্বনো যাক।'

হিলারী বললেন, 'বেশ। চল যাই।'

হিলারীও উঠে পড়লেন। জুতো পরতে গিয়ে দেখেন, ঠাণ্ডায় জমে তা পাথরের মত শক্ত হ'য়ে গেছে। সর্বনাশ! হিলারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সঙ্গে আর তো জুতোও নেই।

হিলারী বললেন, 'এখন উপায়?'

তেনজিং বললেন, 'দেখা যাক। গরম করলে যদি কোনও ফল হয়।'

তেনজিং আবার স্টোভ জ্বাললেন। তারপর হিলারীর বুট জোড়া গরম করতে লাগলেন।

তেনজিং যতক্ষণ হিলারীর বুট গরম করবেন, আসুন, আমরা ততক্ষণে আগের কথাগুলো সেরে ফেলি।

*   *   *   *   *   *

*   *   *

গতবারে সুইসদের সঙ্গে যে অভিযানে তেনজিং গিয়েছিলেন, তার ধকল সামলাতে তিনি পারলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। তার উপর নভেম্বর মাসে (১৯৫২) কাঠমাণ্ডুতে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। ডিসেম্বরেও সে জ্বর ছাড়ল না। পাটনার এক হাসপাতালে দশ দিন তিনি প'ড়ে থাকলেন। তারপর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তেনজিং দারজিলিঙে ফিরে এলেন। তাঁর ওজন তখন বাইশ পাউণ্ড কমে গেছে।

একে অসুখ তার উপরে অর্থের অভাব। নিদারুণ অভাব। মেয়ে দুটোর ইস্কুলের মাইনে বাকী প'ড়ে গেল। গতবারের অভিযানে সুইসরা যে টাকা দিয়েছিল, তা কবে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। আছে শুধু তাঁদের দেওয়া পোষাকগুলো, পাহাড়ে উঠবার বুট জোড়া, ঘুমবার ব্যাগ আর তাঁবুটা। ছোট ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি ক'রে সব চিহ্নগুলো এখানে ওখানে প'ড়ে আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্বল তেনজিং সেগুলোর ওপর চোখ বোলান, ক্লান্তি এলে চোখ বোজেন। শুধু যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছেন নেপালের মহারানার দেওয়া

পদকটা। এ পর্যন্ত তেনজিং সকলের চাইতে উঁচুতে উঠেছেন। অবশ্য এভারেস্টে উঠতে পারেন নি। সাতশ ফুট বাকী থাকতেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও এখনও পর্যন্ত তেনজিং সব চেয়ে উঁচুতে উঠেছেন। তারই সম্মানার্থে মেডেলটা দেওয়া। এক একবার মেডেলটা দেখেন আর উৎসাহ পান।

অর্থাভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে তেনজিং ভাবলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কিছু টাকা ধার চাইবেন। সেই টাকায় মেয়েদের ইস্কুলের বেতনটা দিয়ে দেওয়া যাবে।

অসুস্থতা আর অভাবের আক্রমণে তেনজিং যখন বিপর্যস্থ হ'য়ে পড়েছেন, হতাশ হয়ে পড়ছেন, এমন সময় সুইজারল্যাণ্ড থেকে একখানা চিঠি পেলেন। লিখেছেন রেমণ্ড ল্যাম্বেয়ার।

তিনি লিখেছেন, "বন্ধু, পর্বতারোহণ সম্পর্কে যারা কিছুটাও জানে, তাদের কাছেও তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। যদি আসো, দেখবে, ইওরোপ তোমায় কিভাবে সম্বর্ধনা জানাবে।"

আর প্রায় সেই সঙ্গেই লণ্ডন থেকে দারাজিলিঙের হিমালয়ান ক্লাবের সম্পাদিকার কাছে এক চিঠি এল। তেনজিং-এর খবর কি? আগামী মার্চে যে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী এভারেস্ট অভিযানে নেপাল যাবে, তেনজিংকে কি তাঁদের সঙ্গে পাওয়া যাবে?

দারাজিলিঙের হিমালয়ান ক্লাবের সম্পাদিকা মিসেস হেণ্ডারসন প্রস্তাবটা তেনজিংকে জানালেন। ইতিমধ্যে সুইস্, ফরাসী আর জাপানীদের কাছ থেকেও প্রস্তাব এসে গেছে। তেনজিং ভাবতে লাগলেন, কাদের সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে? কিন্তু মিসেস হেণ্ডারসন তেনজিং-এর সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিলেন। পরামর্শ দিলেন, ব্রিটিশ দলটার সঙ্গে যেতে। বললেন, এদের সঙ্গে গেলেই তাঁর ভাল হবে। তেনজিং রাজী হলেন।

ব্রিটিশরা তাঁকে মাসে ৩০০ টাকা ক'রে দিতে রাজী হলো। কিন্তু

তেনজিং সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। টাকার জন্য নয়, ব্রিটিশরা তাঁকে ব্রিটিশ আলপাইন ক্লাবের সদস্য করতে রাজী হলেন না। অথচ সুইসরা তাঁকে বিনাবাক্যে সুইস্ আলপাইন ক্লাবের সদস্য-পদের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

যা হোক, তেনজিং দারজিলিঙ থেকে খুব উঁচুতে উঠতে অভ্যস্থ কুড়িজন শেরপা নিয়ে রওনা হলেন, রক্সৌল পর্যন্ত ট্রেনে, তারপরে ভীমপেদি থেকে হাঁটা পথে কাঠমাণ্ডু। ৪ঠা মার্চ (১৯৫৩) তাঁর সঙ্গে কর্নেল হাণ্টের কাঠমাণ্ডুতে সাক্ষাৎ হলো।

কর্নেল এইচ সি জন হাণ্ট এবারকার ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলটির নেতা। বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। বাড়ি ওয়েল্সে। একেবারে দুঁদে 'মিলিটারী ম্যান'। ব্রিটেনের স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্র। গত যুধে চতুর্থ ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে গ্রীস, ইতালী আর মিশরে বাহিনী পরিচালনা করেছেন। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে এল আলেমিনের বিখ্যাত মরু যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি রোমেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। রোমেল তখন অজেয়। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে সেদিন যাঁরা তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন, কর্নেল হাণ্ট তাঁদের একজন। অজেয় এভারেস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য তাই কি এবারে তাঁকেই অধিনায়ক করা হলো ?

কর্নেল হাণ্ট ছাড়া আরও বারজন সাহেব এবারের অভিযানে যোগ দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে মেজর সি জি উইলিও স্যাণ্ডহার্স্টের ছাত্র। বয়েস তেত্রিশ। এবারকার এভারেস্ট অভিযানের সংগঠনের ভার ওঁর। ডব্লিউ নয়েসের বয়েস পঁয়ত্রিশ, তিনি ইস্কুলের মাস্টার আবার লেখকও। এর আগে গাড়োয়াল এবং সিকিমে কয়েকবার অভিযান চালিয়ে গেছেন। ২৩৩৮৫ ফুট উঁচু এক চূড়ায় তিনি উঠেছেন। টি ডি বুর্দিলোঁ একজন বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ্। তাঁর

বয়েস উনত্রিশ। ১৯৫১ সালে আর ১৯৫২ সালে দ্‌বার এসেছিলেন হিমালয় অভিযানে। এ গ্রেগরীর বয়েস চল্লিশ। জি সি ব্যান্ড হচ্ছেন ভূতাত্ত্বিক, তাঁর বয়েস চব্বিশ। আর সি ইভান্স একজন চিকিৎসক, বয়েস চৌত্রিশ। জি লোয়ের বাড়ি নিউজিল্যান্ড। তাঁর বয়েস আঠাশ। তিনিও একজন শিক্ষক। এম ওয়েস্টম্যাকটের বয়স আঠাশ। ডাঃ এম ওয়ার্ড, বয়েস আঠাশ, ইনি দলের মেডিক্যাল অফিসার। ডাঃ এল জি সি পাগের বয়েস তেতাল্লিশ, ইনি শারীর-তত্ত্ববিদ্। টি স্টবার্টের বয়স প'য়ত্রিশ, ইনি ফটোগ্রাফার।

এই দলে আরো একজন আছেন, নাম এডমন্ড পি হিলারী, তাঁর বাড়ি নিউজিল্যান্ড, বয়েস চৌত্রিশ। লম্বা হিলহিলে চেহারা। একট্‌ লাজ্‌ক। দেশে তাঁর মধ্‌র চাষ আছে।

আর আছেন তেনজিং নোরকে, বয়েস তাঁর বিয়াল্লিশ। তাঁর পরিচয় পরের পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। তেনজিং-এর শেরপা দলের মধ্যে সব চাইতে বয়েস বেশী দাবা থোন্দাপের। আর সব চাইতে কম তোপগায়ের, মাত্র সতের, এরা দ্‌জন ছাড়া পাসাং দাবা, আঙ্ নাভিগল, আঙ্ শেরিং, আঙ্ তেম্বার, পেম্বার আঙ্ নিমাও এবারে তেনজিং-এর সঙ্গে ছিলেন। এ'রা প্রত্যেকেই 'টাইগার'—বাঘ।

কর্নেল হান্টের দলে বাছা বাছা লোকই শ্‌ধ্‌ নেই, সরঞ্জামও যা আছে তাও অন্যান্য সব বারের চাইতে উৎকৃষ্টতর। অক্সিজেনের যন্ত্রপাতির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে তৈরি ক'রে আনা হয়েছে খাবার, পোষাক, তাঁব্‌ প্রভৃতি। ব্রিটেনের বিজ্ঞ বিজ্ঞানী আর দক্ষ কারিগরেরা সে সব জিনিস তৈরি ক'রে দিয়েছেন। সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে কর্নেল হান্টের দলের মতো আর কোনও দল এত ভালভাবে সজ্জিত ছিল না। গতবারের স্‌ইস্ দলটাও নয়।

তব্‌ও এত জিনিস সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা কিসের অভাব

৬

থেকে গেল। আর সে অভাব ধরা পড়ল শেরপাদের কাছে। কর্নেল হাণ্টের ব্যবহার সবটাই কেতাদুরস্ত, আন্তরিকতার অভাব বড় বেশী। আর একটা ব্যাপারে শেরপারা অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠল। সাহেবদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে কর্নেল হাণ্ট দেখিয়ে দিলেন।

কাঠমাণ্ডুতে শেরপাদের খাওয়া-থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে তারা খুশী হ'তে পারেনি। কেউ কেউ বলেই ফেলল, "আমাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করছে না এরা।"

তেনজিংকে অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হলো। তাও কোথায়? একটা মোটরের গ্যারেজে। তেনজিং সেখানে থাকলেন না। সোজা এক হোটেলে চ'লে গেলেন।

গোলমাল দেখে একজন এসে শেরপাদের বোঝালেন, একটা দিন কোনওমতে কাটিয়ে দাও। কাল ভাটগাঁতে গিয়ে অন্য বন্দোবস্ত করা যাবে।

ভাটগাঁ কাঠমাণ্ডু থেকে আট মাইল দূরে। সেখান থেকেই এবারে নামচেবাজার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নামচেবাজার যাবার পথ চারটে। একটা দারজিলিঙ থেকে। সেই পথ এমনই দুর্গম যে শেরপা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। তবু এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, সে পথ অতিক্রম করার সময় সাবধানী শেরপারা এখানে ওখানে পরিত্যক্ত অনেক চিহ্ন দেখেছে, হয়ত একটা মাথার টুপি, কি একপাটি জুতো, কি শার্ট। কার? কে জানে? কোন্ অতর্কিতে বরফের বিরাট এক চাঙড় কোন্ হতভাগ্যের ঘাড়ে ভেঙে পড়বে, আগের মুহূর্তেও কেউ বলতে পারে না। হয়ত বহুদিন পরে এই সব চিহ্ন কেউ কুড়িয়ে নিয়ে আসবে, শেরপা পল্লীতে সেদিন তুমুল উত্তেজনা দেখা দেবে। রান্নাঘরের কাজ ফেলে শেরপানীরা ছুটে আসবে। পুরুষরা আসবে জ'মে আসা জুয়াকে ফ্যালাছড়া

ক'রে। তারপর কোনো শেরপানী হয়ত বুকভাঙা কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, তার স্বামীর চিহ্নে মুখ গুঁজে। প্রায় ভাবলেশহীন মুখখানা এগিয়ে আনবে কোনো ক্ষীণদৃষ্টি অশীতিপর বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাবে, হ্যাঁ, এটা তারই ছেলের, তার একমাত্র ছেলের। কম্পমান আলো তাদের সকলের বিমূঢ় মুখগুলোকে দেওয়ালের উপর আছড়ে ফেলতে থাকবে। দীর্ঘশ্বাস পাইনের বাতাসের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে খেতে উঠে উপরে মিলিয়ে যাবে। তারপর—

তারপর তিনরাত্তিরেও পার হবে না। ক্ষুধার কামড়ে অস্থির হ'য়ে বোঝা পিঠে নিয়ে সেই দুর্গম পথেই আবার পা বাড়াবে কোনো শেরপা তরুণ।

ভারত সীমান্ত দিয়ে নামচেবাজার যাবার এ ছাড়া আরো দুটি পথ আছে। জয়নগর থেকে একটা আর যোগবানী থেকে আরেকটা—এই দুটো পথই দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়েছে। জয়নগরের পথে ঘুরতে হয় অনেক বেশী। যোগবানী থেকে বরং দূরত্ব কম। লোকে বলে পনের দিনের পথ, কিন্তু ১৯৫১ সালে মিঃ এরিক শিপটন লোকের কথায় নির্ভর ক'রে বিস্তর নাকানি চোবানি খেয়েছেন। তিনি এই পথেই চলেছিলেন তাঁর অভিযাত্রী দল নিয়ে। দুদিন না যেতেই নামল প্রচণ্ড বর্ষা। পথঘাট মুছে গেল, সাঁকো ভেসে গেল। ভারবাহকরা কেউ কেউ দিলে পিঠটান। ভদ্রলোকের একেবারে যেন দশদশা। প্রায় একমাস লাগল তাঁর নামচেবাজার পৌঁছতে।

তাই এবার কাঠমাণ্ডুর পথে যাওয়া। গত বছরের অভিযাত্রীরাও এই পথ অনুসরণ করেছিলেন।

এই পথের আরো একটা মস্ত সুবিধা, প্রচুর ভারবাহক মেলে।

কাঠমাণ্ডু থেকে নামচেবাজারের দূরত্ব ১৭০ মাইল। অভিযাত্রীরা দুটি দলে ভাগ হ'য়ে গেলেন। প্রথম দলটি তৈরি হলো

নয়জন সাহেব, ১৮ জন শেরপা আর ১৬২ জন ভারবাহক নিয়ে। এদের সঙ্গে মালপত্র থাকল প্রায় ৯০০ পাউণ্ড ওজনের। আরেকটি দলে থাকলেন কর্নেল হাণ্ট স্বয়ং, তিনজন সাহেব, ২০০ জন ভারবাহক আর দুজন শেরপা। এ'রা মাল সঙ্গে নিলেন প্রায় ৮০০ পাউণ্ড।

নানা ধরনের মালপত্র এবার এ'দের সঙ্গে আছে। খাবার থেকে শুরু ক'রে অক্সিজেন, ওষুধ থেকে শুরু ক'রে বরফ স্তূপের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটবার উপযোগী জুতো, তাঁবু আর ফিলিম তোলার ক্যামেরা, অ্যালুমিনিয়মের মই আর কেরোসিন স্টোভ, কিছু আর বাকি নেই। নানা বারের বিফলতা থেকে শিক্ষা পেয়েছেন অভি-যাত্রীরা। বিজ্ঞানের চরম সুযোগ নিয়ে তৈরি করিয়েছেন উপযোগী সরঞ্জাম। সেই বিরাট সম্ভার বাহিত হবে পাহাড়ী মানুষের পিঠে পিঠে। যাবে ভাটগাঁ থেকে নামচেবাজার। নামচেবাজার থেকে উঠবে থায়াংবক মঠে। সেখান থেকে উঠবে আরো উপরে—আরো উপরে—আরো উপরে। লক্ষ্য এভারেস্ট শিখর।

কাঠমাণ্ডু থেকেই শেরপাদের সঙ্গে সাহেবদের খিটিমিটি শুরু হয়েছিল, ভাটগাঁয় এসে তাতো মিটলই না, আরো বরং বেড়ে গেল। ভাটগাঁতে শেরপাদের একটা ক'রে ঘুমবার ব্যাগ দিয়ে দেওয়া হ'ল। আর কিছু না। অথচ সুইসরা গতবার এখান থেকেই তাদের জুতোও দিয়েছিল। সেকথা কর্নেল হাণ্টকে বলা হলো।

কর্নেল হাণ্ট সাফ জবাব দিলেন, 'অন্যে কি করেছে না করেছে তা আমার দেখবার কথা নয়। আমি আমার মত চলব। নামচেবাজার না গেলে কেউ জুতো পাবে না।'

জবাব শুনে শেরপারা গজগজ করতে লাগল।

বলল, 'এই রকম ব্যবস্থা হবে জানলে আমরা আসতামই না।'

তেনজিং তাদের বোঝালেন, 'এখন যখন রওনা হ'য়ে পড়েছি,

তখন আর গোলমাল ক'রে কাজ নেই। নামচেবাজার পেঁছিলে বন্দোবস্ত একটু উন্নত হবে।'

তেনজিং-এর কথায় সবাই প্রবোধ মানল। তারপর শুরু হলো যাত্রা। প্রথম দলটি রওনা দিলেন ১০ই মার্চ, দ্বিতীয়টি তার পরের দিন।

বিরাট সম্ভার ব'য়ে নিয়ে মানুষের বিরাট বহর চলেছে। এঁকে-বেঁকে, উঠতে উঠতে, নামতে নামতে। পথের যেমন শেষ নেই, তেমনি এই যাত্রারও যেন ছেদ নেই।

সে কী পথ! পাকদণ্ডি। কোথাও কোথাও মাত্র একটি পা-ই রাখা যায় এমন অপ্রশস্ত। নেপালের তরাই। মার্চের কি প্রচণ্ড দাবদাহ। যেন পৃথিবী পুড়ছে। সেই ঝলসানো গরমে এক একটি চড়াই উঠতে এক যুগের আয়ু খরচ হ'য়ে যায়। বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। সময় অপচয় করলে চলবে না। মাপা মুহূর্ত হাতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে সকল পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

এভারেস্ট জয় করতে কি লাগে? মানুষের উদ্যম, বিজ্ঞানের সাহায্য, আর? আর আবহাওয়ার প্রসন্ন দৃষ্টি। প্রথম দুটিকে মানুষ আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু আবহাওয়ার মর্জি দেবা ন জানন্তি। এটা শুধু জানা, মে-এর শেষ সপ্তাহ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়টুকুই স্বর্ণক্ষণ। এই পনের দিনের মধ্যে যদি কাজ সমাধা হলো তো হলো। নইলে এভারেস্টে ওঠার আর আশা নেই।

মার্চের প্রথম দিকেও বরফ গলা শেষ হ'য়ে ওঠে না। আবার জুন আসতে না আসতেই মৌসুমী প্রবল ধারা ঢালতে শুরু ক'রে দেয়। কর্নেল হাণ্ট এবারে আলিপুর হাওয়া অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার খবর পাঠাবার।

তাই সময় বাঁচাও, যত ত্বরা পার চল।

এবারে এখনো বর্ষা শুরু হয়নি। আকাশ পরিষ্কার। প্রকৃতি প্রসন্না। পথের ধারে কখনো কখনো অর্কিডের বেগুনী মুখ কি সোনালী র‍্যাস্প্‌বেরী হঠাৎ দেখা দেয়। কোথাও রডোডেনড্রনের অজস্র সমারোহ। কোথাও গাঢ় লাল, কোথাও মাখন-সাদা, কোথাও ফিরোজা, কোথাও বেগুনী, কোথাও বা হলদে। একখানা বাহারী কার্পেটের উপর কত রঙের যে টানা পোড়েন!

পথ কখনো কখনো গোঁ ধ'রে উঠে গেছে খাড়া। এমনই খাড়াই যে সারাদিন ধরে অভিযাত্রীরা উঠছে তো উঠছেই। হাঁফ ধ'রে ওঠে বুকে। শিরদাঁড়া টনটন করে। অন্তরাত্মা ছটফট করে একটুক্ষণ বিশ্রামের জন্য।

বাঁ ধারে নগাধিরাজ। সহস্রশীর্ষ, সমুন্নত। চোখের সীমানায় বন্দী। কিন্তু হাত বাড়াও, নাগাল পাবে না। সহজে নয়। কৃতিত্বের মূল্য ভিন্ন তাকে আয়ত্তে আনবে কি দিয়ে?

পার্বত্য নদী ছুটে চলেছে চপলা মেয়ের মত পাথর থেকে পাথরে ঝাঁপ দিতে দিতে। দূরে দূরে কলকল খলখল কলোচ্ছ্বাসে ছুটেছে।

ক্বচিৎ বিপরীত থেকে কোনো পর্বতবাসীর দল এসে পড়ছে, পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে নীরবে। কারো বোঝায় চাল, মশলা। কারো বোঝায় বা হাঁস মুরগী। পিঠে-বোঝা মানুষগুলি আসছে হয়ত নামচেবাজার থেকেই। হয়ত আরো দূর, তিব্বতের কোনো অংশ থেকে।

অভিযাত্রীদের অনেকটা সুবিধে হয়েছে বর্ষা বৃষ্টি না নামাতে। পার্বত্য নদীতে জল কম, ঝর্ণাগুলো প্রায় শুকনো। নদীখাতের পাথরগুলো সিঁড়ি প্রায় বানিয়েই রেখেছে। পা দিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেলেই হলো। তবে ফিরতি পথে বর্ষা নামবেই। পথ হবে পিচ্ছিল। তখন হবে সমস্যা।

আরো এক সর্বনাশা উৎপাত তখন দেখা দেবে। জোঁক।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রক্তচোষা লুকিয়ে থাকবে ঘাসের ডগায়, আগাছার পাতায়, গাছের ডালে। লোক পেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে, মাথায়, জড়িয়ে ধরবে পায়ে।

ঘোর বর্ষার পিচ্ছিল পথের সঙ্গে লড়াই ক'রেই জিভ বেরিয়ে আসে, তার উপর আবার খাঁড়ার ঘা। জোঁক ছাড়াও।

অজস্র চড়াই উৎরাই। শুধু আরোহণ আর অবরোহণ। শারীরিক শ্রমের অতলস্পর্শী সাগরে কয়েকশত মানুষের নিরন্তর অবগাহন। অভিযাত্রী দল চলেছে। শেরপারা চলেছে, পাশে শেরপানীরাও আছে। ভারবাহী এক বিরাট বাহিনী চলেছে। কোনো পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে এদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন এক বিরাট অজগর সাপ চলেছে।

দিনের পর দিন কাটে। মানুষের ঘামের ফোঁটা আর দুশ্চিন্তা দুর্গম পথকে বশ ক'রে আনে। কাঠমাণ্ডু বহুদূর, বহু নীচে।

অভিযাত্রী দল নামচেবাজার এসে পৌঁছলেন। প্রায় দু সপ্তাহ সময় লাগল।

নামচেবাজার। শেরপাদের পিতৃভূমি। সাগরপৃষ্ঠ থেকে ১৩,০০০ ফুট উঁচুতে। আর কাঠমাণ্ডু থেকে দূরত্ব হবে ১৭০ মাইল। একটানা ভ্রমণের পর অভিযাত্রী দল এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন।

শেরপাতে শেরপাতে মেলামেশা সে এক দেখবার বিষয়। বলিষ্ঠকায় এইসব পর্বতাত্মজের হাসি, সে এক শোনবার জিনিস। অভিযাত্রী দল পৌঁছতে না পৌঁছতেই গোটা গ্রাম জড়ো হলো এসে। আর তর সয়না কারো। হাসাহাসি, ঘেঁষাঘেঁষি শুরু হ'য়ে গেল। এস এস, ঘরে এস। কেমন আছ? ভাল ছিলে? ততক্ষণে আগন্তুক শেরপারা প্যাকিং খুলে ফেলেছে। বের করতে শুরু

করেছে নানা উপহার। একী, রুমাল? তালা? বিস্কুট? সাবান? এক একটা উপহার বের হয়, এক একটা হাত এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করে। খুশির ঢেউ বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আর হাসির তরঙ্গ প্রাণে দোলা লাগায়। কাঠমান্ডু থেকে বেরিয়ে দুদিনের পথ পার হ'য়ে ঝড়ের হাতে যখন শেরপারা পড়েছিল (সে কথা এখন, এই উপহারগুলো বিলি করবার সময় এক এক ক'রে মনে পড়ছে), তখন কি আপ্রাণ লড়েছিল এরা মালগুলো বাঁচাবার জন্যে। সেই রিসেঙ বৌদ্ধমঠে কি তাদের হয়রানি! হা হা ক'রে ঝড় ছুটে এল। কি প্রচন্ড তার গতিবেগ! এই বুঝি সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড়কে এরা প্রতিহত করল। একটি মানুষ নয়, এক কুচি মাল নয়, কারোরই ক্ষতি করতে পারল না ঝড়। ঝড় থামল কিন্তু বিপদ থামল না। চড়চড় ক'রে নামল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি। আর কি বড় বড় সব শিল। মাথায় পড়লে খুলি ভেঙে যায়। তিন ঘন্টা ধ'রে সমানে লড়াই চলল মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ জিতল। অশেষ পরিশ্রমের মূল্যে। তবে সে মূল্য দেওয়া যে সার্থক হয়েছে, তাতো তাদের খুশী মুখ দেখেই বোঝা যায়। নামচেবাজার নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন, এই দুটো দেশের মধ্যে। এখানে বাসিন্দা বলতে মাত্র ৬০টি ঘর। খুম্বু জেলায় এই ষাট ঘরের মতো গুরুত্ব আর কিছুরই নেই।

কর্নেল হান্টের দল এখানে একটু দম নিয়ে নিলেন। তারপর আরো উপরে, একটু উত্তরে, থায়াংবক মঠে গিয়ে শিবির ফেললেন। থায়াংবকের বৌদ্ধ শ্রমণরা এ'দের অভ্যর্থনা করলেন। আশীর্বাদ জানালেন।

দুধকুশী আর ইমজা খোলা নদী দুটোর সংগমস্থলেই এই মঠ। কর্নেল হান্ট ঠিক করলেন, এখানে তিন সপ্তাহ কাটাবেন। তারপর এখান থেকেই এভারেস্ট অভিযান শুরু করবেন।

কর্নেল হাণ্টের হাতে এখন অনেক কাজ। তাঁর দলের লোক-দের এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। খাপ খাইয়ে নিতে হবে তার সঙ্গে। আশেপাশে লোক পাঠিয়ে দেখতে হবে নতুন কোনো পথ মেলে কি না। সমস্ত জায়গাটা জরিপ করাও দরকার।

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। বহু জায়গা জরিপ করা হলো। অনেক পাহাড়ে চড়া হলো। কিন্তু সে তো স্বতন্ত্র কাহিনী।

কর্নেল হাণ্ট পরিকল্পনা করলেন, আটটা কি নয়টা শিবির স্থাপন করবেন। প্রথম শিবিরটি থাকবে থায়াংবক মঠে। আর সব থেকে উঁচুর শিবিরটা স্থাপন করবেন ২৭ হাজার থেকে ২৮ হাজার ফুটের মধ্যে কোনো এক জায়গায়।

থায়াংবক মঠ ছেড়ে এগিয়ে গেলেই খুম্বু হিমবাহ। কর্নেল হাণ্ট এখানকার পাতলা বাতাসে তাঁর দলের লোকদের চলতে ফিরতে অভ্যস্ত করিয়ে নিলেন। যত উপরে উঠবে বাতাস ততই পাতলা। সমতলের লোকেরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যতটা অক্সিজেন পায়, উপরে অক্সিজেন তার থেকে ঢের কম। সমতলের কোনো লোককে এভারেস্টের চূড়ায় তুলে দেওয়া হ'লে সে নব্বই সেকেণ্ডও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। তাই, একমাত্র উপায় হচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধ'রে এসব অঞ্চলে থেকে, এখানকার আবহাওয়া দুরস্ত ক'রে নেওয়া।

নগাধিরাজ হিমালয় এভারেস্টের কাছে এসে ত্রিশীর্ষ ত্রিচূড় হয়েছেন। নাপ্‌সে, লোৎসে আর এভারেস্ট। তিনটি চূড়া। ত্রিমূর্তি। ট্রিনিটি। যেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। জানি না অনাদি অতীতে আমাদের কোনো পর্বতবিহারী পূর্বপুরুষ হিমালয়ের উচ্চ-শীর্ষ দেখতে এসে, এই তিনটি চূড়া দেখেছিলেন কিনা। এবং ত্রিমূর্তির কল্পনা তাঁর মনেই প্রথম উদয় হয়েছিল কিনা কে বলবে।

একেবারে গোড়ার শিবিরটি থাকল থায়াংবক মঠে। থায়াংবক

মঠেই খুম্বু অঞ্চলের শেষ মনুষ্য-বসতি। এখান থেকে দুদিনের পথ এগিয়ে গেলেই পশ্চিম 'কম'। এক বিস্তীর্ণ তুষারখাত। মনে হয় যেন বিরাট এক গামলায় কেউ অন্তহীন আইসক্রীম বানিয়ে রেখেছে।

থায়াংবকে এসে আবার শেরপাদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হলো। সাহেবরা এখানে শেরপাদের তাঁবু, পোষাক, জুতো প্রভৃতি সরঞ্জাম দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ফিরে এসে প্রত্যেকটি জিনিস হিসেবমত ফেরত দিতে হবে। আর যাবে কোথায়? শেরপারা ক্ষেপে উঠল। এই সমস্ত জিনিসপত্র শেরপারা সেই প্রথম অভিযানের সময় থেকে স্মারক হিসাবে রেখে আসছে। আজ পর্যন্ত কেউই ফেরত চায়নি। এইরকম মনোমালিন্য চলতে থাকলে এভারেস্ট অভিযান সফল হবে কিনা সে বিষয়ে তেনজিং সন্দিহান হলেন।

কর্নেল হাণ্টকে তিনি বললেন, 'জিনিসপত্র ফেরত দেবার প্রস্তাব আমি ওদের কাছে করতে পারব না সাহেব। করতে হয় তুমি করো। তবে তুমি যদি এ বিষয় নিয়ে ওদের উপর চাপ দাও, তবে এ বছরে তোমাকে আর এভারেস্টে উঠতে হবে না।'

তেনজিং যা ভয় করেছিলেন তাই ঘটল। সাজসরঞ্জাম ফেরত দিতে হবে শুনে সবাই বেঁকে বসল। কেউ আর এগুতে চায় না। তেনজিংএর সহকারী পাসাং ফুটার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখে আগেই চটেছিলেন। সাহেবরা টিনের খাবার খাবে, আর শেরপাদের দেওয়া হবে স্থানীয় খাদ্য, এ কেমন ব্যবস্থা? পাসাং ফুটারের আত্মাভিমানে ঘা লাগল। দুস্তোর বলে তিনি থায়াংবক থেকে ফিরে চ'লে গেলেন। তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরো কয়েকজন শেরপা ফিরবার জন্য তৈরি হলো। তেনজিং দেখলেন সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি শেরপাদের প্রবোধ দিতে গেলেন। বোঝালেন, এভারেস্ট যখন নাগালের মধ্যে, তখন ফিরে যাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে

না। চল আগে এভারেস্টে উঠি, যদি উঠতে পারি তখন এসব নিয়ে বোঝাপড়া হবে।

শেরপারা শেষ পর্যন্ত বললে, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তখনও সব কিছু 'আচ্ছা' হয়নি। আবার ঝামেলা বাধল। এবার মাল বওয়া নিয়ে। সাহেবরা চায়, ৬০ পাউণ্ড ক'রে বোঝা এক একজন শেরপার পিঠে চাপাতে। কিন্তু তারা সাফ বলে দিল, ৬০ পাউণ্ড বোঝা তারা বইতে পারবে না। তেনজিং আবার সালিশ করলেন, প্রত্যেককে ৫০ পাউণ্ড ক'রে বইতে হবে। এ-ব্যবস্থায় আর কেউ আপত্তি করল না। এর পর আর বিশেষ গোলমাল হয়নি। গোড়ার শিবিরে পৌঁছে খাবারও সবাইকে এক রকম দেওয়া হলো। সাহেবরা বললেন, যার কাছে যে জিনিস আছে, সেগুলো ভাল কাজ যারা দেখাবে তাদের পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সব গোলমালের শান্তি হলো।

পশ্চিম 'কম্' থায়াংবক মঠ থেকে দুদিনের পথ। নাপসে, লোৎসে আর এভারেস্ট—এই তিনটি শৃঙ্গের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ তুষারভূমি প্রসারিত হ'য়ে আছে। সমুদ্রতল থেকে ২৩০০০ ফুট উঁচুতে। যেমন দুর্গম তেমনি ভয়াবহ।

এই পশ্চিম 'কমে'র মধ্য দিয়ে পথ বানাতে হবে। শিবির বসাতে হবে। ধাপে ধাপে মালপত্র ব'য়ে নিয়ে নিয়ে একেবারে অগ্রগামী শিবিরে পৌঁছে দিতে হবে। পথ শুধু বরফ কেটে তৈরি করলেই চলবে না, তাকে টিঁকিয়েও রাখতে হবে, নইলে যারা এগিয়ে গেছে, ফিরবে কেমন ক'রে?

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে হাতাহাতি সংগ্রাম তা শুরু হলো এই পশ্চিম 'কম্' থেকে। কুড়ুলের ঘায়ে মানুষ সকালের দিকে ধাপ কাটে, অপরাহ্ণের প্রবল তুষারপাতে তা কোথায় তলিয়ে যায়। দড়ির পরে দড়ি জুড়ে মানুষ এগিয়ে যাবার পথ গড়ে, প্রচণ্ড তুষারঝটিকা কোথায়

তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতি আর মানুষের এই বিভীষণ পাঞ্জার লড়াই এক মুহূর্তের তরেও বিশ্রাম পায় না। প্রতিটি পদক্ষেপই সেখানে মারাত্মক সংগ্রাম। প্রতিবার নিঃশ্বাস নেওয়াও সেখানে প্রাণপণে লড়াই করা।

এই মরণপণ লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতির বাধাকে কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলতে ঠেলতে অভিযাত্রী দল একটু একটু ক'রে এগিয়ে চললেন। অভিযাত্রীদের মধ্যে বাছাই করা পর্বতারোহীরাই শুধু চললেন। আর চলল নিতান্ত আবশ্যকীয় মালগুলো ব'য়ে বাছাই করা শেরপারা। ওঁরা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন আর শিবির পড়ছে এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ... শিবির গাড়তে গাড়তে কর্নেল হাণ্টের দল চলল। তেনজিং, হিলারী, ইভান্স্, বুর্দিলোঁ, নয়েস্, কর্নেল লোয়ে, ব্যাণ্ড, উইলী, ওয়েস্টম্যাকট্, গ্রেগরী আর স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট এগিয়ে চলেছেন। শিবির পড়ছে ছয়...সাত...সঙ্গে সঙ্গে শেরপারা চলেছে... আন্নুল্লু, দা নাম্‌গিল, আঙ তেনজিং (এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং নয়, অন্য লোক)। চলেছে প্রৌঢ় দাবা থোন্দাপ, বহু অভিযানে সে অভিজ্ঞ। আর চলেছে কিশোর শেরপা তোপগায়। সতের বছর মাত্র বয়েস। এই তার প্রথম অভিযান।

সমস্ত পথটাকে তিনটে ভাগ করা হলো। প্রথমটুকু, পশ্চিম 'কম' অতিক্রম করা, দ্বিতীয়টুকু, লোৎসে ডিঙিয়ে যাওয়া আর শেষটুকু, দক্ষিণ 'কল' অতিক্রম করা। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড় এভারেস্টের উপর।

সময় ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হ'য়ে আসছে। কর্নেল হাণ্ট স্থির করলেন, আর মুহূর্তমাত্র দেরি নয়। যত সত্বর সম্ভব দক্ষিণ 'কল্'-এ মালপত্র পৌঁছে দিতে হবে। বারজন শেরপা আর একজন পর্বতারোহী নিয়ে দল তৈরি করা প্রথমে ঠিক হয়েছিল। পরে মত বদলে আটজন

ক'রে শেরপা নেওয়া হলো। বাকী চারজন করে রিজার্ভ রাখা হলো।

কর্নেল হাণ্ট নয়েসের দলের সঙ্গে পঞ্চম শিবির পর্যন্ত এলেন। সেদিন ১৯শে মে। ঠিক হলো নয়েস মালপত্র নিয়ে সপ্তম শিবির পর্যন্ত যাবেন। তার পরদিন সপ্তম শিবির থেকে মালপত্র নিয়ে দক্ষিণ 'কল্'-এ পৌঁছবেন। পৌঁছে, ওইদিনই যদি শিবিরে ফিরে আসা অসম্ভব দেখেন, তাহলে ঠিক হলো, নয়েস্ মালপত্র আর শেরপাদের সপ্তম শিবিরেই রেখে দেবেন; শুধু তিনি, মাত্র একজন শেরপাকে নিয়েই দক্ষিণ 'কল্' পর্যন্ত রাস্তা তৈরি ক'রে আসবেন।

২০শে মে নয়েস দলবল নিয়ে সপ্তম শিবিরে হাজির হলেন। উত্তেজনায় সে রাত্রে কর্নেল হাণ্টের ভাল বিশ্রাম হলো না। ২১শে মে সকাল থেকেই কর্নেল হাণ্ট চেয়ে রইলেন দিগন্তপ্রসারী শুভ্রতার মধ্যে সেইদিকে, যেদিকে নয়েস্ গিয়েছেন। নটা, দশটা—ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। সামান্য টিকটিক্ আওয়াজটাও হাণ্টের হৃৎপিণ্ডে ধ্বক্ ধ্বক্ আঘাত করছে। দিনটা পরিষ্কার। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। হঠাৎ প্রায় এগারোটার সময় কর্নেল হাণ্টের হৃৎপিণ্ডে ধ্বক্ ক'রে একটা জোর আঘাত পড়ল। সীমাহীন অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে বহুদূরে দুটো কালো বিন্দু ভেসে উঠেছে। নয়েস বেরিয়ে পড়েছে তাহলে। সঙ্গে আন্নুলু শেরপা। হাণ্ট দেখলেন বিন্দু দুটো দড়ি বেয়ে বেয়ে সোজা উঠে যাচ্ছে। শেরপাদের আর নিতে পারেনি। তারা শিবিরেই রইল। শেরপাদের নিতে না পারায় কর্নেল হাণ্ট একটু হতাশ হলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি 'কল্'-এ পৌঁছতে চাইছিলেন।

ওদিকে পঞ্চম শিবির থেকে উইলী যাত্রা করেছেন। তিনিও সেইদিনই সপ্তম শিবিরে পৌঁছে যাবেন। তাহলে সপ্তম শিবিরে ভিড় প্রচুর বেড়ে যাবে। তবে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায়ও ছিল না। কর্নেল হাণ্টের একমাত্র লক্ষ্য এখন 'কল্'-এ

পৌঁছনো যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। তাঁবু, অক্সিজেন, কুকার, স্টোভ, খাবার—এগুলো নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

হঠাৎ এক আপদ শুরু হলো। সপ্তম শিবির থেকে কর্নেল হাণ্টের কাছে খবরাখবর আসছিল যে বেতার যন্ত্রটিতে, তা গেল বিগড়ে। নয়েস বা উইলীর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। নয়েস 'কল' পর্যন্ত গিয়ে শিবিরে ফিরে এসে যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ে? গুরুতর পরিশ্রমে আরেকবার যেতে যদি অক্ষম হ'য়ে পড়ে, তখন?

কর্নেল হাণ্ট কালবিলম্ব না ক'রে ইভান্স আর হিলারীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, সিদ্ধান্ত হলো, আরো দুজনকে পাঠাবার। নয়েসের সাহায্যের জন্য হিলারী আর তেনজিং-ই শেষ পর্যন্ত রওনা দিলেন।

পর্বতারোহণ একজনের সাধ্য নয়। একটা দলের সমবেত প্রচেষ্টারই সেখানে প্রয়োজন। কর্নেল হাণ্ট তাঁর দলকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল। তেনজিং ছিলেন শেরপাদের সর্দার। মালপত্র যাতে ঠিকমত পৌঁছয় তার তদারক করা ছিল তাঁর বিশেষ দায়িত্ব। কর্নেল হাণ্ট প্রত্যেক অভিযাত্রীর সঙ্গে দশ জন শেরপাকে জুড়ে এক একটা দল করেছিলেন। শিবিরে শিবিরে প্রয়োজনমত মাল যাতে পৌঁছে দিতে পারা যায়, এ ব্যবস্থা সেজন্যই করা হয়েছে। এ ছাড়া পাহাড়ে উঠবার জন্য দুজন ক'রে অভিযাত্রী নিয়ে কয়েকটা দল তৈরি করা হলো। এভারেস্ট বিজয়ের জন্য এইরকম দুটো দলকে বাছা হলো। প্রথম দলে থাকলেন চার্লস ইভান্স আর টম বুর্দিলোঁ। দ্বিতীয় দলে থাকলেন তেনজিং আর হিলারী। ব্যবস্থা হলো, ইভান্স আর বুর্দিলো ঢাকা 'অক্সিজেন সেট্' নেবেন, আর খোলা অক্সিজেন সেট্ ব্যবহার করবেন তেনজিং আর হিলারী।

ইভান্স আর বুর্দিলোঁর প্রধান কাজ ছিল যতটা সম্ভব এগিয়ে

গিয়ে পথঘাট সম্পর্কে পরিচয় নেওয়া, আর যদি সম্ভব হয়, তবে এভারেস্টে উঠবার একটা চেষ্টা করা।

তেনজিং আর হিলারী ছিলেন 'রিজার্ভ'। আগের দলটি অকৃতকার্য হ'লে তবে এ'দের চেষ্টা শুরু হবে। দারজিলিঙ থাকতে তেনজিং-এর যে দুর্বলতা ছিল, অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে যেতে লাগল। যতই তিনি এভারেস্টের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই তাঁর দেহে বলের সঞ্চার হতে থাকল। থায়াংবক পেঁছেই সে কথা তিনি তাঁর দারজিলিঙের বন্ধু মিত্র-বাবুকে লিখে পাঠালেন।

আগেই বলেছি, পাহাড়ে চড়া একজনের কাজ নয়। পিঁপড়েদের চাল এখানে মানুষকে অনুকরণ করতে হয়। এক একটা দল এক একটা শিবিরে মালপত্র পেঁছে দেয়। দিয়ে তারা ফিরে আসে গোড়ার শিবিরে। গোড়ার শিবির থেকে নতুন দল যাত্রা করে, সেই শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। নিয়ে পরদিন তারা উঠে যায় আরো এক ধাপ উঁচু শিবিরে, মালপত্র সেখানে নামিয়ে রেখে ফিরে আসে। যাত্রা করে নতুন আরেকটা দল। শিবিরের যেমন নম্বর দেওয়া থাকে এক দুই তিন......, তেমনি দলেরও নম্বর থাকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়......। কোন্ দল কতদূর উঠবে সে সমস্তই আগে থেকে ঠিক করা থাকে।

গোড়ার শিবিরকে ইংরেজীতে বলে 'বেস্ ক্যাম্প'। কর্নেল হাণ্টের 'বেস্ ক্যাম্প' ছিল থায়াংবক মঠে। এই বেস্ ক্যাম্পই হলো আসল ঘাঁটি। কর্নেল হাণ্ট কাজের সুবিধের জন্য ২১০০০ ফুট উঁচুতে আর একটা 'বেস্ ক্যাম্প' করলেন। এই 'বেস্ ক্যাম্প' থায়াংবক ক্যাম্পটা থেকে ৯০০০ ফুট উঁচুতে। এই অগ্রবর্তী 'বেস্ ক্যাম্প' থেকেই অভিযান পরিচালিত হ'তে থাকল।

একুশে এপ্রিল অভিযাত্রীরা প্রথম 'বেস্ ক্যাম্পে' এসে পেঁৗছেছিলেন।

আর তেনজিং আর হিলারী চতুর্থ শিবিরে পেঁৗছলেন ১৫ই মে। এখান থেকেই তাঁরা বুর্দিলোঁ আর ইভান্সের পিছু নিলেন।

থায়াংবক থেকেই তেনজিং পরামর্শ দিচ্ছিলেন সঙ্গে ক'রে ১০।১৫টা বড় বড় খুঁটি নেবার জন্য। দক্ষিণ 'কল্'-এ যাবার রাস্তা সুবিধের নয়। এমন সব বড় বড় গহ্বর আছে যা টপকানো যায় না, সাঁকো বানিয়ে পার হ'তে হয়। গতবারে সুইসদের সঙ্গে অভিযানে এসে তেনজিং-এর সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শটা প্রথম দিকে কর্নেল হাণ্ট নিতে চান নি। খুঁটি বইতে গেলে বেশী লোক নিতে হয়। এক একটি খুঁটি তিনজনের কমে বইতে পারে না। বেশী লোক নিলে খরচটাও বেড়ে যাবে। কর্নেল হাণ্ট সেটা ভেবেই ইতস্তত করছিলেন।

হিলারী বললেন, 'তেনজিং, খুঁটির কি দরকার? সঙ্গে তো অ্যালুমিনিয়মের একটা মই-ই আছে।'

তেনজিং হেসেছিলেন। খুঁটির কি দরকার! টের পাবে সাহেব, আরো কিছুটা ওঠো। হিমালয়ের অভিজ্ঞতা বেশী নেই তো। যে সব শেরপা সুইসদের দলে ছিল তারাও সমর্থন জানাল তেনজিংকে। অগত্যা কর্নেল হাণ্ট সম্মত হলেন। সম্মত হ'য়ে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা পরে প্রতি পদে বুঝেছিলেন।

ইভান্স আর হাণ্ট তৃতীয় শিবিরে আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন। তেনজিংরা পিছনে আসছিলেন। ও'রা দু নম্বর শিবিরে অনেক মাল পেঁৗছে দিলেন। রাতটা সেখানে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন তৃতীয় শিবিরে পেঁৗছলেন। মালপত্র সেখানে রেখে সেইদিনই তাঁরা থায়াংবক শিবিরে নেমে গেলেন।

এই সময় একদিন হিলারী দ্বিতীয় শিবিরের কিছু নিচুতে পা পিছলে এক গহ্বরের মধ্যে প'ড়ে গেলেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত হিলারী হতচকিত হ'য়ে গেলেন। তারপর বিপদটা বুঝতে পারলেন। হিলারী ভীমবেগে গড়িয়ে চলেছেন এক অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে। কত হাজার ফুট গভীরে কে জানে। ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। আর্তস্বরে সাহায্যের জন্য চিৎকার ক'রে উঠলেন 'তেনজিং তেনজিং।'

তেনজিং আগেই দেখেছিলেন। হিলারীর আর তাঁর দেহ একই দড়িতে বাঁধা। হিলারীর দড়িটা মাথায় চট ক'রে জড়িয়ে নিলেন। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে হিলারীর পতন রোধ করলেন। প্রচণ্ডবেগে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এক হ্যাঁচকা টান লেগে গতি থেমে গেল। শূন্যে ঝুলতে লাগলেন হিলারী। তারপর তেনজিং-এর আকর্ষণে একটু একটু ক'রে উপরে উঠলেন। কৃতজ্ঞতায় হিলারীর মুখে বাক্ ফুটলো না। শুধু বললেন, 'তেনজিং, সাবাস।'

চতুর্থ শিবিরে দুজনের মধ্যে হিলারীই আগে পৌছলেন, তেনজিং তার পরে। তেনজিং সেখানে উপস্থিত হ'য়েই জায়গাটা চিনতে পারলেন। সুইসরা গতবারে এখানেই তাদের শিবির ফেলেছিল। যাবার সময় অনেক খাবারদাবার, অনেক জিনিসপত্র বরফের নীচে পুঁতে রেখে গিয়েছিল, যদি কারও কাজে লাগে। তেনজিং এখানে ওখানে খুঁড়ে প্রচুর জিনিস বের করলেন। প্রচুর খাবার পাওয়া গেল, আর কয়েকটা অক্সিজেন-বোতল।

জিনিসগুলো কেমন আছে, দেখবার জন্য তেনজিং খানিকটা লেবুর গুঁড়ো বের ক'রে জলে গুলে পান করলেন। চমৎকার। কিছুই নষ্ট হয়নি। সবাই খুব খুশী। অন্তত নীচের শিবির

থেকে খাবার ব'য়ে আনবার পরিশ্রমটা বেঁচে গেল। তেনজিং সেই-দিনই থায়াংবক ফিরে গেলেন।

অগ্রবর্তী 'বেস্ ক্যাম্প' আর থায়াংবকে তেনজিং আর হিলারীকে বারকয়েক আনাগোনা করতে হলো। মালপত্র আনবার তদারকের জন্যও বটে আবার ওঠানামায় অভ্যস্ত হবার জন্যও বটে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত যা যা মাল দরকার সবই যখন পেঁাছে গেল অগ্রবর্তী 'বেস্ ক্যাম্প'-এ, তখন শুরু হলো এভারেস্টের উপর চরম আঘাত দেবার জল্পনা কল্পনা।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত যা হলো, তা আগেই বলেছি। কথামত বুর্দিলো আর ইভান্স প্রথমে যাত্রা করলেন। আর তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে তেনজিং আর হিলারী ওঁদের অনুসরণ করলেন।

২২শে মে। সোয়া তিন ঘণ্টা পর চতুর্থ শিবির থেকে তাঁরা সপ্তম শিবিরে পেঁাছলেন। এই শিবিরটা লোৎসের মুখোমুখী, ২৪০০০ ফিট উপরে। আলফ্রেড গ্রেগরী আর জর্জ লোয়ে আগেই এসে পড়েছেন সেখানে। তাঁদের সঙ্গে শেরপা আছে তিনজন—আঙ নিমা, আঙ তেম্বার আর পেম্বার। কথা আছে এঁরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের চূড়ার দিকে আরো এগিয়ে মালপত্র পেঁাছে দিয়ে আসবেন। তেনজিংদের সঙ্গেও পাঁচজন শেরপা আছে। তাঁরা দক্ষিণ কল্ পর্যন্ত ওঁদের পেঁাছে দিয়ে ফিরে আসবেন।

সে রাত্রে অক্সিজেন টানতে টানতে চারজনে দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন। পরদিন সকালে উঠেই ওঁরা যাত্রা করলেন দক্ষিণ কল্-এর দিকে। সাড়ে নটার সময় ওঁরা যখন লোৎসে হিমবাহের শীর্ষে, হঠাৎ হিলারীর নজরে পড়ল, দিগন্তবিসারী শ্বেতশুভ্র মহা তুষারক্ষেত্রের দক্ষিণপূর্ব দিকে যে চূড়াটি তার গায়ে দুটি সচল বিন্দু ফুটে উঠেছে। ইভান্স আর বুর্দিলো চলেছেন এভারেস্টের দিকে। একটু পরে কর্নেল হাণ্টকে দেখা গেল। শেরপা দা নাঙ্গিলের

সঙ্গে খাবার আর অক্সিজেন ব'য়ে নিয়ে চলেছেন, বুর্দিলোর যেদিকে গেছেন সেইদিকে। পরের দলটির কাজে লাগবে সেগুলো। লোৎসে পার হ'য়ে হিলারীরা যখন দক্ষিণ কল্-এ এসে পোঁছলেন, তখনও তাঁরা হাণ্টদের দেখতে পাচ্ছিলেন।

দক্ষিণ কল্-এর শিবিরে কর্নেল হাণ্ট দা নাঙ্গিলের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁদের অবস্থা অতি শোচনীয়। কর্নেল হাণ্ট যে অক্সিজেন নিয়ে গিয়েছিলেন, তা উপরেই রেখে এসেছিলেন পরের দলটির ব্যবহারে লাগবে ব'লে। বিনা অক্সিজেনে এই পথটুকু আসতে ওদের প্রায় জীবন বেরিয়ে গেছে। কর্নেল হাণ্টের অবস্থা দেখে তেনজিং ২০০ ফুট উঠে গিয়ে হাণ্টকে শিবিরে আসতে সাহায্য করলেন। হাণ্ট নবম শিবির স্থাপন করতে পারেন নি। সুইস্‌রা গতবারে যেখানে সপ্তম শিবির ফেলেছিল, তিনি তার সামান্য উঁচুতে উঠেছিলেন মাত্র। প্রায় ২৭৩৫০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন।

এভারেস্ট বোধ হয় আঁচ করেছিল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাই সাবধান হলো। দুদিন ধ'রে বাতাসের বেগ ক্রমাগত বাড়ছিল। তা উপেক্ষা ক'রেই লোৎসে টপকিয়ে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ কল্-এর শিবিরে এসে বিশ্রাম নিলেন। ঝড়ের বেগে আরো একদিন সেখানে অচল হ'য়ে রইলেন। তারপর ২৬শে মে, ইভান্স আর বুর্দিলো দক্ষিণ কল্-এর শিবির থেকে ঢাকা অক্সিজেন সেট্ নিয়ে যাত্রা করলেন। যাত্রার গোড়াতেই বাধা পড়ল। অক্সিজেন সেট্‌টি বিগড়ে গেল। সেগুলো মেরামত করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। তারপর দুজনে রওনা দিলেন। সাড়ে তিনটের সময় দেখা গেল বুর্দিলো আর ইভান্স পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পাহাড়টাকেও আর দেখা গেল না। মেঘের পর মেঘ জ'মে পাহাড়টা ঢেকে দিল। শিবিরে ব'সে গভীর উৎকণ্ঠায় কর্নেল হাণ্ট অপেক্ষা

[illegible] রইলেন সংবাদের। এভারেস্টে ওরা উঠতে পারল কি? প্রায় সাড়ে ছটায় ইভান্স আর বুর্দিলো ক্লান্ত, পর্যুদস্ত হ'য়ে ফিরে এলেন। এভারেস্ট তখনো অজেয়। এ'রা শুধু দক্ষিণ চূড়ায় উঠেছেন। মূল চূড়াটা তখনও বাকী। দক্ষিণের চূড়াটা আসল চূড়া নয়। আসল চূড়া আরো উ'চুতে। আরো তিনশ ফুট, কিংবা তারো বেশী। আরো কয়েকশ ফুট অসম্ভব আরোহণ, তারপর আকাঙ্ক্ষিত জয়লাভ।

সে জয়লাভ তাঁরা করতে পারেন নি, তা ব'লে তাঁদের এই অমানুষিক পরিশ্রম বিফল হয়নি। দক্ষিণ চূড়া পর্যন্ত পথ তাঁরা তৈরি ক'রে আসতে পেরেছেন। পরবর্তী অভিযাত্রীদের পথ কিছুটা সুগম করেছেন। সেটাও একটা বড় কীর্তি।

তেনজিং আর হিলারী প্রায় ১০০ ফুট এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। গরম চা খেতে দিলেন।

শিবিরে ফিরতেই তেনজিং ও'দের মুখ থেকে অক্সিজেন মুখোশ খুলে ফেললেন। তারপর লেবুর জল খেতে দিলেন। এক একজন প্রায় সের দুয়েক ক'রে লেবুর জল ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

একটু সুস্থ হ'লে তেনজিং ইভান্সকে পথের খবর জিজ্ঞাসা করলেন।

ইভান্স বললেন, 'তেনজিং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি এবারে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারবে। তবে পথ অতি দুর্গম। আমার মনে হয়, তোমাদের পৌঁছতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।'

তেনজিং বারবার ইভান্সকে জিজ্ঞেস করেন, 'পথ কেমন, অকপটে বল সাহেব।'

'বললাম তো,' ডাঃ ইভান্স বলেন, 'আগামীবারে আর তোমাকে

এখানে আসতে হবে না। আবহাওয়াটা যদি ভাল থাকে এইরকম তো তুমি এইবারই উঠতে পারবে। তবে দেখো, দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে চ'লো।'

* * * * * *

* * *

হিমালয় মানুষের পায়ের শব্দ শুনেছিল। প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিল, এভারেস্টের বিপদ এবার ঘনিয়ে এসেছে। তাই তারাও তোড়জোড় শুরু করল। মানুষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মানসে প্রকৃতি প্রতি-আক্রমণ করতে লাগল। আর সে আক্রমণের রূপ যে কী ভীষণ, কী প্রচণ্ড তা টের পেলেন অভিযাত্রীরা, ২৬শে মে'র রাত্রে, অষ্টম শিবিরে কয়েকটা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে।

কদিন ধরেই বাতাসের বেগ বাড়ছিল। এখন তা চরমে পৌঁছল। ভীম বেগে প্রবাহিত ঝটিকার সঙ্গে প্রবল তুষারপাত শুরু হোলো। তাপমাত্রা যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই কমতে লাগল। ঠাণ্ডায় অভিযাত্রীরা জ'মে যাবার মত হলেন। ঝটিকার রকম দেখে তাঁরা প্রমাদ গণলেন। বেগ যদি আর একটু প্রবল হয়, তবে আর রক্ষা নেই। তাঁবু উড়ে যাবে, তাঁরাও উড়ে যাবেন। তুষারবর্ষণ যদি না থামে, অবিরল পড়তে থাকে, তবে তাঁরা হয়ত তার নীচে সমাধিস্থ হ'য়ে যাবেন।

শীতের চোটে অষ্টম শিবিরে সে রাত্রে কারো ভাল ঘুম হল না। কর্নেল হাণ্ট, বুর্দিলো, ইভান্স—ওঁরা একেই সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তার উপরে শীতের এই প্রচণ্ড আক্রমণ—ওঁরা আরও কাহিল হ'য়ে পড়লেন। লোয়ে, গ্রেগরী আর হিলারীর অবস্থা অত খারাপ না হ'লেও, তাঁরাও বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। এমন কি এভারেস্টের কোলে যাঁর জন্ম সেই তেনজিং-এরও স্বস্তি ছিল না।

পরদিন বাতাসের বেগ সামান্য কমল। কিন্তু তখনও বেগ ভীষণ। কর্নেল হাণ্ট, বুর্দিলো আর ইভান্স নেমে গেলেন। তাঁরা এতই দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন যে লোয়ে আর হিলারী তাঁদের ধরাধরি ক'রে নামিয়ে দিলেন। আঙ তেম্বার ব'লে যে শেরপাটির মাল ব'য়ে আরও উঠবার কথা ছিল, অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁকেও ফেরত পাঠাতে হলো।

সেদিনও সমস্তক্ষণ, সমস্ত রাত্রি ধ'রে হিমেল ঝড়ের মাতামাতি চলল আর তুষার অঝোর ধারায় ঝরতে লাগল। তেনজিং আর হিলারী এগিয়ে যাবার জন্য কয়েকবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু বৃথা। প্রকৃতির সেই ভয়াবহ রুদ্রাণী মূর্তির মুখোমুখী হওয়া তাঁদের সাধ্য কি। তাঁরা ভোরের প্রতীক্ষায় রইলেন।

পরদিন ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি প্রসন্না হলেন। বাতাসের বেগ অনেকটা ক'মে এল, কিন্তু নতুন এক সর্বনাশের সম্মুখীন হ'য়ে হিলারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলেন। শেরপা পেম্বার গত রাত্রে নিদারুণ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তিনজন শেরপা ওঁরা সঙ্গে এনেছিলেন। তার মধ্যে অসুস্থ আঙ তেম্বারকে গতকালই ফেরত পাঠান হয়েছে। পেম্বারেরও এই অবস্থা। উঠতেই পারছেন না। ও'কে সঙ্গে নেবার তো কথাই ওঠে না, নামিয়ে দেওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বিপদটা এভাবে আসবে, কেউ ভাবতে পারেন নি। আর শেরপাদের মধ্যে আছেন সবে ধন নীলমণি আঙ নিমা। কিন্তু তিনি আর কত বোঝা বইবেন।

হিলারী আর তেনজিং-এর সামনে এখন মাত্র দুটো পথ খোলা। হয় গোটা শিবিরটা নিজেদেরই কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া আর নয় এবারের মত ফিরে যাওয়া।

ফিরে যাওয়া? এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় বরবাদ ক'রে শেষ

পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। তেনজিং আর হিলারী ঠিক করলেন মাল তাঁরাই বইবেন।

তদনুযায়ী সমস্ত মালপত্র নতুন ক'রে বাঁধাছাঁদা করতে হ'ল। যেগুলো না নিলে একেবারেই নয়, মাত্র সেগুলোই তাঁরা নিলেন। এমন কি অক্সিজেনও কিছু তাঁদেরকে ফেলে রেখে যেতে হ'ল। সকাল আটটা প'য়তাল্লিশ মিনিটে লোয়ে, গ্রেগরী আর নিমা অষ্টম শিবির ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ৪০ পাউন্ড ক'রে মাল নিয়েছেন।

হিলারী আর তেনজিং তাঁদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ১০টার সময় রওনা দিলেন। ওঁদের পিঠে ৫০ পাউন্ড ক'রে মাল ছিল। ও'রা খুব ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন। ঢালু বেয়ে উঠতে উঠতে একটা খাড়া চূড়ার নীচে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ আগে এই পথ দিয়ে লোয়েরা এগিয়ে গেছেন। তাঁরা পাহাড়ের গায়ে যে ধাপ কেটে রেখে গেছেন তাইতে পা রেখে রেখে এ'রা স্বচ্ছন্দে উঠে গেলেন। চূড়ার উপরে যখন উঠলেন, তখন দুপুর। লোয়ে, গ্রেগরী আর আঙ নিমা সেখানে ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তেনজিং আর হিলারীও বোঝা নামিয়ে তাঁদের পাশে ব'সে পড়লেন।

ভারী সুন্দর জায়গাটা। গতবারে সুইসরা এখানে শিবির ফেলেছিল। চতুর্দিকের সৌন্দর্য দেখে অভিযাত্রীরা মুগ্ধ হলেন। হিলারী কয়েকখানা ফটোও তুললেন।

তারপর তাঁরা আবার উঠতে লাগলেন। দেড়শ ফুট উঠে তাঁরা, হাণ্ট দুদিন আগে যে পর্যন্ত উঠেছিলেন, সেখানে পোঁছলেন। হাণ্ট অনেক মালপত্র রেখে গেছেন। জায়গাটা ২৭৩৫০ ফুট উঁচুতে। কিন্তু ও'রা ভাবলেন নবম শিবিরের জন্য আরও উঁচুতে ওঠা দরকার। তখনও খানিকটা ওঠবার ক্ষমতা সকলেরই আছে।

হান্ট য়ে সমস্ত মালপত্র রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন।

একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে তাঁরা বেলা দুটো পর্যন্ত উঠলেন। একে একে সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে লাগলেন। কোথাও এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কোথাও শিবির ফেলা দরকার। ও'দের বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম নেবেন? পাহাড়টা উঠে গেছে তো গেছেই। চূড়াটাই এখনও নজরে পড়ল না। আর কতদূর উঠতে হবে?

তেনজিং বললেন, আরো খানিকটা উঠলে পরে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের খাঁজ পাওয়া যাবে। তিনি ল্যাম্বেয়ারের সংগে গতবার ওখানেই তাঁবু ফেলেছিলেন। অতি কষ্টে প্রায় আড়াইটে নাগাদ ওঁরা সেখানে পৌঁছলেন। হান্ট যেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ও'রা সেখান থেকে আরও সাড়ে পাঁচশ ফুট উপরে উঠেছেন। পরিশ্রম খুব হয়েছে। তবু সবাই খুব খুশী। ২৭৯০০ ফুট উঁচুতে নবম শিবির ফেলতে পারা গেল দেখে সবাই কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। কালবিলম্ব না করে লোয়ে, গ্রেগরী আর নিমা নেমে গেলেন।

* * * *
* *

নবম শিবিরে ২৮শে মে'র শেষ রাত্রে স্টোভটা একটানা গর্জন করে চলেছে। একজোড়া বুট গরম প্রায় হ'য়ে এল। হিলারী ঘুমবার ব্যাগ ছেড়ে তখনও বাইরে বের হননি। তেনজিং স্টোভটা আরেকবার প্যাম্প ক'রে দিলেন। আগুনে জোর হ'ল। তিনি হাত দুটো বাড়িয়ে শেঁকতে লাগলেন।

হিলারীর ঘুমবার ব্যাগের মধ্যে শুয়ে শুয়ে মনে হলো, তিনি জমে গেছেন। তাঁর পা দুটো প্রবল শৈত্যাঘাতে বোধ হয় পঙ্গু

হ'য়ে গেছে। পর্বতারোহীদের কাছে এ-বিপদ নতুন নয়। এর আগেও অনেক অভিযাত্রীর, বহু শেরপার এ-দুর্দশা ঘটেছে। জন্মের মত কারো পা গেছে, কারো গেছে হাতের আঙুল। দারজিলিঙ শহরে এরকম হতভাগ্যদের সাক্ষাৎ হামেশাই পাওয়া যায়। হিলারীর ভয় হলো। শুয়ে শুয়ে স্টোভের গর্জন শুনছেন, মনে পড়ছে বাড়ির কথা। বাইরে তুষার ঝড় চলেছে। তবে তার গতিবেগ আগের তুলনায় ঢের কম। হিলারীর মনে পড়ল তাঁর দেশের—নিউজিল্যান্ডের পর্বতটার কথা। কতবার যে তাঁর চূড়ায় উঠেছেন দলবল নিয়ে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ হিমালয়, সে পর্বত নয়।

কোথায় নিউজিল্যান্ড আর কোথায় হিমালয়ের দক্ষিণ 'কল্'! ভাবতেই হিলারীর আশ্চর্য লাগল। দেশে ছিল মৌমাছির চাষ। সব ফেলে রেখে এভারেস্টে চড়তে এসেছেন তিনি। এভারেস্ট চড়ার স্বপ্ন তাঁর অনেকদিনের। এই তো এভারেস্ট। তাঁবুর বাইরেই অপেক্ষা ক'রে আছে মাথা উঁচু ক'রে। সেই গর্বোদ্ধত শীর্ষ আজও অজেয়। এবারও কি অজেয়ই থেকে যাবে? হিলারীর মনে পড়ল তাঁর মায়ের কথা। আসবার সময় তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন, সফল হও। কোথায় কতদূরে তাঁর দেশ, তবু এখান থেকেই যেন উঁকি মেরে দেখা যায় তাঁদের রান্নাঘরখানা। মা পোষাকের উপরে অ্যাপ্রনখানা জড়িয়ে পছন্দসই খাবার বানাচ্ছেন। আর বাবা, সেই একরোখা বৃদ্ধ পাইপ মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে। তাঁকে বোঝাবে সাধ্য কার? বাবার কথা মনে পড়তেই হিলারীর খুব মজা লাগে। সত্যি, বুড়োরা বড় অবুঝ। তাঁদেরকে কোনো কিছু বোঝানো এভারেস্টে ওঠারই সামিল। ভারতবর্ষে এসেও অবাক হয়েছেন হিলারী। এ বড় অদ্ভুত দেশ। একেবারে আলাদা

দুনিয়া। প্রকৃতি যেমন খামখেয়ালী, তেমনি মানুষগুলো। হিলারীর হঠাৎ মনে পড়ল ছাতাটার কথা। ছাতা নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। কর্নেল হাণ্টের টেলিগ্রাম পেয়ে তোড়জোড় শুরু করলেন আসবার। মা এটা বাঁধেন সেটা কেনেন। হিলারীর সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাতা ছাতা ক'রে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। এ দোকান সে দোকান তোলপাড় ক'রে শেষকালে একটা ছাতা পছন্দ হলো। কিনলেন। এদিকে শহর সুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেছে হিলারীর ছাতা কেনা নিয়ে। বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিত সকলেরই এক প্রশ্ন, কি হে তোমার আবার ছাতার এমন কি দরকার পড়ল? হিলারীর এক জবাব—এভারেস্টে যাচ্ছি। এভারেস্টে যাচ্ছ! গো টু এভারেস্ট! (এভারেস্ট যাবে!) সকলের চক্ষু ঊর্ধ্বগামী হল। উইথ্ অ্যান্ আম্ব্রেলা!! (ছাতা নিয়ে!!) তাঁদের মুখের হাঁ প্রশস্ত হলো। কেউ কেউ টিপ্পনিও কাটলেন। তা কাটো, হিলারী মনে মনে ভাবলেন। বাছাধনদের তো আক্কেল নেই, পড়তে নেপালী বৃষ্টির গুঁতোয় তো বুঝতে বৃষ্টি কাকে বলে। হিলারীর মনে হলো, তাঁর মা, বাবা, বন্ধুবান্ধব কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না, ওঁরা এখন কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। তাঁবু ফাঁক করলেই আকাশ দেখা যায়। আকাশ নয়, মেঘের স্তূপ। বাইরে অনবরত তুষার ঝরছে। সামান্য শব্দও এখন অন্য কিছুর বার্তা ব'য়ে আনে। এতো আমাদের প্রতিদিনের দেখা জগত নয়। এখানে সবই অদ্ভুত, সবই অপার্থিব। সেই অজানা পৃথিবীতে ছোট্ট এক তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দুজন জানা-পৃথিবীর মানুষের একজন—হিলারী, ভাবলেন. এই তো একটু পরেই তাঁদের চরম চেষ্টা শুরু হবে। এর আগে বুর্দিলো আর ইভান্স ফিরে গিয়েছেন। তার আগে, তারও আগে বহু বহু জন ফিরে গেছেন। তাঁদের যেখানে শেষ, হিলারী আর তেনজিং-এর সেখান থেকে শুরু।

সে কথা হিলারীর ঠাণ্ডা বুটজোড়া গরম করতে করতে তেনজিং-এরও মনে পড়ল। গতবারেও তেনজিংকে ফিরে যেতে হয়েছে। শেষ ৭০০ ফুট আর কিছুতেই ওঠা গেল না। ল্যাম্বেয়ার কাহিল হ'য়ে পড়েছিলেন। শৈত্যাঘাতে তাঁর পা অবশ হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তেনজিং তখনও তাজা ছিলেন, তখনও তাঁর দম ছিল। তিনি এগিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। ল্যাম্বেয়ার বাধা দিলেন। বললেন, তেনজিং জীবন আগে, তার পরে এভারেস্ট। এবার আমরা পরাজিত হয়েছি। ফিরে যাই চল। ওঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু আফসোস থেকে গিয়েছিল তেনজিং-এর মনে। আবার তিনি ফিরে এসেছেন। এবারে কি হবে? এবারেও কি পরাজিত হবেন? ফিরে যাবেন আকাঙ্খিতকে লাভ না ক'রেই?

কর্নেল হাণ্টের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, যদি সুস্থ থাকেন তবে তেনজিংকে এভারেস্টে উঠবার সুযোগ দেবেন। হাণ্ট সে চুক্তি রেখেছেন। তেনজিং কাঠমাণ্ডুতে এক খবরের কাগজের সংবাদ-দাতার কাছে বিবৃতি দিয়েছিলেন, "যদি সুযোগ পাই. এবার শেষ চেষ্টা করব। করেঙ্গে ইয়া মরঙ্গে।" করব না হয় মরব—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। দারজিলিঙ থেকে যাত্রা করবার সময় এক বাঙালী সাংবাদিক (শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা) তাঁর হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে বলেছিল, "বন্ধু, এভারেস্টে যদি উঠতে পার, তবে আমার দেশের পতাকাটাও সেখানে উড়িও।" সে পতাকা তেনজিং-এর পকেটে আছে। তার সঙ্গে আরও তিনটে পতাকা আছে—বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের, নেপালের আর ব্রিটেনের। সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হ'য়ে পতাকা বহনের যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, এবারেও কি তা পালন করতে পারবেন না?

এভারেস্ট এবারেও দূরে থেকে যাবে? সাহেবরা বলে,

এভারেস্ট অভিযান। কিন্তু তেনজিং বৌদ্ধ। তাঁর অত গর্ব নেই। বাল্যকাল থেকে জেনে এসেছেন, ওই যে এভারেস্ট, চোমোলাংমা, যার মাথার উপর দিয়ে পাখিও উড়তে পারে না, সেখানে তাঁর ইস্টদেবের বসতি। এভারেস্টে আসা তাই তাঁর কাছে জয়যাত্রা নয়, তীর্থযাত্রা। তবে এ তীর্থ মহত্তম তীর্থ। তেনজিং-এর কি তেমন ভাগ্য হবে না, সেই তীর্থের পবিত্র রেণু স্পর্শ করবার?

অবশেষে গরম টরম ক'রে হিলারীর বুটজোড়া পরবার মত হলো। পুরো একটি ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় হলো।

হিলারী বুটজোড়া পরতে পরতে বললেন, 'তেনজিং, আমার মনে হচ্ছে ল্যাম্বেয়ারের মত আমার পাও অসাড় হ'য়ে গেছে।'

তেনজিং সাহস দিলেন, ও কিছু নয়। তারপর কফি বানালেন। কফির পর তাঁরা আবার একচোট পেটপুরে লেবুজল খেয়ে নিলেন। অভিযাত্রীদের কাছে লেবুজলের তুল্য প্রিয় জিনিস আর কিছু নেই। পাহাড়ে উঠতে তেষ্টা পায় প্রচুর। শুধু জল খেলে পেট ব্যথা হয়। তাই তাঁরা লেবুজল আর চিনি খান। তেনজিং আর হিলারী যতটা পারলেন লেবুজল খেলেন। তারপর বোতলে ভ'রে সঙ্গেও কিছুটা নিলেন।

গত রাত্রে ওঁরা চার ঘণ্টা অক্সিজেন টেনেছিলেন। ঘণ্টায় এক লিটার ক'রে। রাত্রি ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আব ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। যতক্ষণ অক্সিজেন নিচ্ছিলেন, বেশ থাকছিলেন। অক্সিজেন ছাড়া ওঁদের খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। রাত্রে এমনই ঠাণ্ডা পড়েছিল যে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে আরও ষোল ডিগ্রি নেমে গিয়েছিল। একটা মাত্র সুলক্ষণ যে বাতাসের বেগ কমতে কমতে ভোরের দিকে একেবারেই প'ড়ে গেল।

ভোর চারটেয় আবহাওয়া অতি সুন্দর হ'য়ে দাঁড়াল। ভোরের আলোতে চূড়াগুলোর রঙের মাতন শুরু হলো। নীচের দিকে

তাকাতেই নজরে পড়ল অন্ধকার কি দ্রুতগতিতে নেমে যাচ্ছে। কোন গুহায় মুখ লুকোবে যেন তারই চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। প্রায় ১৬,০০০ ফুট নীচে থায়াংবক মঠটা। অন্ধকারকে ঢু মেরে ফুটো ক'রে আলোর সাগরে ভেসে উঠল। মঠটা দেখে তেনজিং কি খুশী। হিলারীকে ডেকে দেখালেন।

হিলারী বললেন, "আমার পা এখনও ঠিক হয়নি। তেনজিং তুমিই আগে চল।"

তাই হলো। যাত্রা করবার আগে আবার একচোট সমস্ত জিনিষপত্র পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হ'ল। দক্ষিণের পর্বত চূড়াটার কিছু নীচে পর্যন্ত তেনজিং আগে আগে চললেন, তারপর হিলারীকে এগিয়ে দিলেন। যিনি আগে যান, তাঁকে বরফ কেটে ধাপ বানাতে হয়। কিন্তু পিছনে যিনি থাকেন, তাঁর দায়িত্বই বেশী। তাঁকে সমস্ত দিক লক্ষ্য রাখতে হয়। দড়িদড়া ধ'রে আগের লোকটির ভার সামলাতে হয়।

ভোর ঠিক সাড়ে ছটায় ওঁরা তাঁবু ছেড়ে বেরোলেন। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। বরফের মধ্যে পা ফেলায় অশেষ সাবধান হতে হয়। এক পা এগিয়েই বারবার জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখে নিতে হয় জায়গাটা যথেষ্ট শক্ত কি না, শরীরের ভার সইবে কি না। ঠুকে ঠুকে নিশ্চিন্ত হ'লে তবে আরেকটি পা এগুনো। ২৮০০০ ফুট পর্যন্ত তেনজিং আগে চললেন। তারপর হিলারী এগিয়ে গেলেন। এখান থেকে পাহাড়ের ধার একেবারে ক্ষুরের ফলার মত সরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আরও কয়েক শ ফুট এগিয়ে যাবার পর তাঁরা অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আরে একী! তাঁরা সেই জনমানবশূন্য দুর্গম পর্বতে, এক গর্তের মধ্যে দু বোতল অক্সিজেন পেলেন। অক্সিজেন পাওয়া মানে

জীবন পাওয়া। ইভান্স আর বুর্দিলো এ পর্যন্ত এসেছিলেন। যাবার সময় অক্সিজেনের বোতল দুটো রেখে গেছেন।

বোতলের গা থেকে বরফ চেঁছে ফেলে হিলারী পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, ঠিকই আছে। যদি হিসেব ক'রে খরচ করেন তো দক্ষিণ 'কল্' পর্যন্ত পেঁাছতে কষ্ট হবে না। হিলারী আর তেনজিং ওঁদের দুজনের দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিলেন।

দক্ষিণ দিকের চূড়াটার শেষ ৪00 ফুট ক্রমেই খাড়া হ'তে লাগল। এগিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তবুও এইটেই একমাত্র পথ। ওঁরা প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে ধাপ কেটে কেটে অবশেষে বেলা ৯টায় উপরে উঠতে সমর্থ হলেন।

সামনেই এভারেস্ট। মহিমময় তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভ্রমে তেনজিং আর হিলারীর মন পূর্ণ হ'য়ে উঠল। ওঁদের আতঙ্ক হ'ল পথের ভয়াবহ রূপ দেখে। ইভান্স আর বুর্দিলো এ সম্পর্কে আগেই হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিলেন। তবু এতটা যেন ওঁদের কল্পনায় ছিল না। ডান দিকে বিরাট বিরাট বরফের কার্নিস ঝুঁকে রয়েছে। বরফগুলো যেভাবে ঝুলে পড়েছে তাতে মনে হয় হাজারো আঙুল যেন বিরাট হিংস্র থাবা বাড়িয়ে আছে। নাগালের মধ্যে পেলেই গলা টিপে ধরবে। ওই কার্নিসের নীচেই অতলস্পর্শী এক গহ্বর। পা ফস্কালেই একেবারে ১২000 ফুট নীচে কাঙসুঙ হিমবাহের উপর ধপ্ ক'রে পড়বে। ওদিকে এগুনো মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

এই বিরাট কার্নিসের বাঁ ধারে পাহাড়ের গা একেবারে খাড়াভাবে নেমে গেছে আরেকটা চূড়া পর্যন্ত। সেই চূড়াটা পশ্চিম কম থেকে উঠেছে। উপর থেকে দেখে মনে হলো এদিকের বরফ খুব কঠিন হ'তে পারে। যদি ধাপ কেটে কেটে ওই চূড়াটায় পেঁাছান যায়, তবে কিছুটা এগুনো যেতে পারে।

এই সময় ওঁদের অক্সিজেনের প্রথম বোতলটি ফুরিয়ে গেল। ওঁরা খালি বোতলটা ফেলে দিয়ে নতুন বোতলে নাক লাগালেন। আর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময় হাতে।

হিলারী কুড়ুলের কোপ লাগালেন বরফের মধ্যে। ছিটকে পড়ল বরফের কুঁচি। হিলারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বরফ বেশ শক্ত। দিব্যি পা রাখা যাবে। কুড়ুলটা বরফে গেঁথে ঝুলে পড়তেও বাধা হবে না।

তেনজিং জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন মনে হচ্ছে?"

হিলারী বললেন, "খুব সুবিধের না।"

তেনজিং বিড়বিড় ক'রে বললেন, "ভালোই হোক আর মন্দই হোক এগিয়ে যেতেই হবে।"

তারপর ওঁরা একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলেন। প্রথমে হিলারী ধাপ কাটতে কাটতে প্রায় ৪০ ফুট এগিয়ে যান। তেনজিং পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন হিলারীর দড়ি ধ'রে। হিলারী উপরে উঠে জায়গামত বেশ ক'রে দাঁড়িয়ে কুড়ুলটা বরফে পুঁতে দড়ি ঝুলিয়ে দেন, আর তেনজিং তাই ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে উঠে আসেন। পরের বার তেনজিং এগিয়ে যান আর হিলারী অমনি ক'রে ঝুলতে ঝুলতে ওঠেন।

তাঁরা এক ঘণ্টা এই রকম ধাপ কাটতে কাটতে আর ঝুলতে ঝুলতে উঠলেন। এমনিভাবে উঠতে উঠতে হঠাৎ এক সময় তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর এগুবার উপায় নেই। তাঁদের সামনে একেবারে খাড়া ৪০ ফুট উঁচু এক পাহাড়ের ধাপ। এই ধাপটা থায়াংবক থেকেই ওরা দূরবীণ দিয়ে দেখেছিলেন। তখনই বুঝেছিলেন এটা টপকাতে ওদের মুশকিলে পড়তে হবে। তবে সে মুশকিল যে এত বিরাট তা বুঝতে পারেন নি। এই পাহাড়টার বাঁ

পাশে বিরাট এক বরফের স্তূপ। আর পাহাড় আর বরফের স্তূপের মধ্যে রয়েছে সরু এক ফাটল। হিলারী এক সাংঘাতিক ঝুঁকি নিলেন। না নিয়ে উপায় ছিল না। এই পাহাড়টা টপকাবার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। হিলারী তেনজিংকে দড়ি ধরতে ব'লে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তারপর অমানুষিক চেষ্টায় এক দেওয়ালে পিঠ আর অন্য দেওয়ালে হাত আর পায়ের চাপ দিয়ে দিয়ে টিকটিকির মত ইঞ্চি ইঞ্চি করে ৪০ ফুট উপরে উঠে গেলেন। তাঁর হাঁটু পিঠ আর হাতের তালুতে বেদনা হলো। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। উপরে উঠেই কয়েক মিনিট নিঃসাড়ে শুয়ে রইলেন। এত কষ্টের পর এটুকু উঠতে পেরে হিলারীর মনে বল এল। বুঝতে পারলেন এবার তাঁরা সফল হবেনই। হিলারী উপর থেকে দড়ি ধরতেই তেনজিংও অমনিভাবে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার তাঁরা উঠতে শুরু করলেন। পাহাড়টা তেমনি উঠে গেছে, ডান ধারে তেমনি বিরাট বিরাট বরফের কার্নিস ঝুলে আছে, আর বাঁ দিকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়টা। ওঁরা ধাপ কাটছেন আর ধীরে ধীরে উঠছেন। যেন পাহাড়টা আর শেষ হবে না, যেন ওঁদের চলারও আর ছেদ পড়বে না।

হিলারী একবার অক্সিজেন দেখে নিলেন। ঠিক আছে। ওঁর ক্লান্তি আসতে লাগল। তেনজিং ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছেন সমানভাবে। যতবার হিলারীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, ততবার তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ইশারা ক'রে হিলারীকে বলেন, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কিন্তু আর কতদূর যেতে হবে? আর কতক্ষণ চলতে পারবেন তাঁরা? শরীরের সামর্থ্য তো অক্ষয় নয়? অক্ষয় নয় অক্সিজেনের পুঁজি? কতক্ষণ ধ'রে যে তাঁরা চলেছেন, এখন আর বোধ হয় তাও মনে করতে পারেন না।

শুধু, যেন অভ্যাসের বসেই তাঁরা উঠে যাচ্ছেন। আরো অনেক

উঠতে হবে। কিন্তু একী? তাঁদের কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল? মরুভূমিতে মরীচিকা থাকে। এভারেস্টেও কি তাই এই দুজন অমিততেজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযাত্রীকে ছলনা করতে এসেছে?

বারবার তাঁরা চোখ বুজলেন, আবার চোখ খুললেন। একবার ইচ্ছে হলো চোখ থেকে 'সান গ্লাস'টা খুলে ফেলে ভাল ক'রে দেখতে। কিন্তু ভয় হলো। পরিষ্কার সূর্যের আলো শাদা বরফের উপর প'ড়ে ভয়ানক জেল্লা দিচ্ছে। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ও জেল্লা চোখে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ অন্ধ হ'য়ে যাবে। তাই নীল চশমা চোখে দিয়েই বার বার চূড়াটার দিকে চেয়ে রইলেন। চূড়াটা তো আর উঠছে না। ঢালু হ'য়ে অন্যদিকে নেমে গেছে। তবে? তবে কি তাঁরা পৌঁছে গেলেন? এভারেস্ট শিখরে? পৃথিবীর সর্বোচ্চ শীর্ষে?

হ্যাঁ, ওই তো, অপরপারে, অনেক নীচে রঙবুক হিমবাহ। চূড়ার এক ধারটা চেপ্টা, অন্য ধারটা খাড়াই। তার উপরে দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁরা বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিলেন। সংবিৎ পেতেই তেনজিং আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, "উঠেছি। আমরা উঠেছি।" হিলারী তা শুনতে পেলেন না। ওঁদের মুখে ছিল অক্সিজেনের মুখোশ। হিলারী তেনজিং-এর কথা শুনতে পেলেন না, তবে বুঝলেন। আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে তেনজিংকে অভ্যর্থনা জানালেন। করমর্দন করবার জন্য হাতটা এগিয়ে দিলেন। তেনজিং হিলারীকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন।

এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তেনজিং? এভারেস্টের চূড়ায়? পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে? তাঁর পদতলে গোটা বিশ্ব? সেই ধ্যানগম্ভীর পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে তাঁর মন বিস্ময়ে পূর্ণ হলো, সম্ভ্রমে ঝুঁকে পড়ল মাথা।

এই এভারেস্ট-শিখর! এই তাঁর শৈশবের স্বপ্নস্থল! কিন্তু

এ তো শুধু মাত্র পাহাড় নয়। এ যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন বিরাট পুরুষ, পৃথিবীর আত্মা। এই কি ধ্যানী বুদ্ধ! প্রভু তথাগত! ওই যে নীচে, নীচে আরো নীচে অজস্র, অসংখ্য, অগণ্য পর্বতরাশি ওরাই তো সেই তেনজিং-এর শৈশবে বাল্যে মা ঠাকুমার মুখে শোনা দেবদেবীগণ। কি শান্ত, কি গম্ভীর, কি বিরাট! হে দেবতা, হে সগরমাতা, যদি আমাদের কলঙ্কী পদস্পর্শ তোমাদের অপবিত্র ক'রে থাকে তো অবোধজ্ঞানে, সন্তানজ্ঞানে আমাদের মার্জনা করো। হে তথাগত, হে শান্ত, হে মহা ধ্যানী, যদি অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্যান-ভঙ্গ ক'রে থাকি, আমাদের মার্জনা করো। হে বিশাল, হে বিরাট, হে মহামহিম, মানুষের দুর্জয় সাহস আর দুর্দম উৎসাহ তোমার কাছে নৈবেদ্য এনেছি। গ্রহণ করো, আমাদের ধন্য করো। তেনজিং-এর সমস্ত অন্তর লুটিয়ে প'ড়ে প্রার্থনা জানাল।

তেনজিং পকেট হাতড়িয়ে যা পেলেন তাই ইষ্টকে নৈবেদ্য দিলেন। পকেটে বিশেষ কিছুই ছিল না, ছিল কিছু বিস্কুট, কিছু মিছরী, চকোলেট আর—

আর একটা ছোট্ট নীল পেন্সিল।

ছোট্ট পেন্সিলটা দেখে তেনজিং-এর বাড়ির কথা মনে পড়ল। দারজিলিঙ থেকে আসবার সময় তাঁর ছোট মেয়ে নীমা এই পেন্সিলটা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিল। কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলেছিল, বাবা ছে মো লাংমায় তথাগত থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে, এটা দিও, ব'লো আমি দিয়েছি।

কতদিন পরে তেনজিং-এর নীমার মুখ মনে পড়ল। আরেক মেয়ে পেমপেম আর স্ত্রী আংলুহুমার চেহারাটাও চোখে ভেসে উঠল। থায়াংবক ছাড়বার পর তেনজিং সমস্ত কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় শুধু একজনের স্থানই ছিল, সে এভারেস্ট। এখন বাড়ির কথা মনে হ'তেই, ফেরার কথা মনে পড়ল। ফেরবার কথা

মনে হ'তেই পথের কথা মনে হলো। কি সাংঘাতিক পথ! সে পথে ওঠা যত কঠিন নামা তার চেয়েও বেশী কঠিন। এই প্রথমবার তেনজিং-এর আতঙ্ক হলো। নামতে পারবেন তো? ফিরে যেতে পারবেন লোকালয়ে?

এভারেস্টে শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছেন ভেবে হিলারী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রমের অবসান শেষ পর্যন্ত ঘটল। কি স্বস্তি! হিলারী নিশ্চিন্ত হলেন। চারদিকের দৃশ্য কি অপূর্ব। হিলারী মুগ্ধ হলেন। দেখলেন তেনজিং আত্মহারা হ'য়ে গেছেন। তাঁর আত্মহারা হ'লে চলবে না। ঘড়ি দেখলেন। বেলা সাড়ে এগারটা। তারিখটা মনে করলেন। ২৯শে মে। অক্সিজেন পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, অক্সিজেন যা আছে তাতে পনর মিনিটের বেশী এখানে থাকা যাবে না। এর মধ্যেই তাঁর যা করবার, যথাসম্ভব ক'রে নিতে হবে।

এভারেস্টের উপরটা একদিকে চেপ্টা, অন্যধারটা উ'চু। উত্তর দিকে শুধুই বরফ, দক্ষিণ দিকে পাথর। আর পশ্চিম দিকটাতে নরম বরফ আর কঠিন পাথর মেশামেশি ক'রে আছে। জায়গাটা অপরিসর। দুতিনজন কোনোরকমে দাঁড়াতে পারে। তবে বিশ ত্রিশ ফুট নীচে বেশ খানিকটা চওড়া জায়গা আছে। সেখানে চেষ্টা চরিত্র ক'রে দুজনের শোবার মত একটা তাঁবু খাটান যেতে পারে।

হিলারী অক্সিজেনের নল নাক থেকে খুলে ফেললেন। তারপর ক্যামেরা বের ক'রে চারধারের ফটো তুলতে লাগলেন। তেনজিং তাঁর কুড়ুলে চারটে পতাকা বেঁধে, কুড়ুলটা তুলে ধরলেন। পত পত ক'রে উড়তে লাগল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ভারত, নেপাল আর ব্রিটেনের পতাকা। বাতাসের বেগ তখন ঘণ্টায় কুড়ি মাইল।

ছবি ভাল উঠবে কিনা, হিলারী বুঝতে পারছিলেন না। ওই

জাব্বাজোব্বা প'রে কি ফটো তোলা যায়? তিনটে ক'রে দস্তানাই পরতে হয়েছে হাতে। দুটো পশমের, তার উপরে আবার একটা বাতাস-প্রুফের। ক্যামেরা ভাল ক'রে ধরতেই পারছিলেন না। যা হোক, কোনও রকমে এভারেস্টের মূল চূড়া, দক্ষিণ চূড়া, ধারে কাছের অন্যান্য চূড়াগুলোর ছবি নিলেন। হঠাৎ তাঁর ঝিমুনি আসতে লাগল, শরীর এলিয়ে পড়তে লাগল। হিলারী বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নাকে দিলেন।

এইবার নামতে হবে। যা অক্সিজেন আছে, তা হিসেব ক'রে খরচা করতে হবে। দক্ষিণ চূড়াটার গোড়ায় তাঁরা ইভান্স আর বুর্দিলোর বোতল দুটো রেখে এসেছেন, সে পর্যন্ত যে ক'রেই হোক এই অক্সিজেনেই চালাতে হবে।

ওঁরা নামতে লাগলেন। আগে নামছেন হিলারী। পেছনে শক্ত ক'রে দড়ি ধ'রে তাঁর ভার সামলাচ্ছেন তেনজিং। উঠবার সময়কার মাদকতা আর নেই। সমস্ত শরীর ক্লান্ত। তবু হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার। পা টিপে টিপে নাম। অসতর্ক হয়েছ কি মৃত্যু। পা ফসকেছে কি নিশ্চিহ্ন। ওঁরা ধীরে ধীরে ঝুলে ঝুলে নামতে লাগলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা সবচেয়ে দুর্গম জায়গাটা পার হ'য়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম নিতে দাঁড়ালেন। পেটপুরে লেবুজল খেয়ে একটু আরামবোধ করলেন। একবার পিছন ফিরে সেই বিভীষিকাময় বিরাট বিরাট বরফের কার্নিসগুলো দেখে নিলেন। অজস্র অতিকায় বরফের আঙুলগুলো কি হিংস্রভাবে ওঁত পেতে আছে। ওরা যেন এভারেস্টের সদাসতর্ক প্রহরী। সুযোগ পেলেই অভিযাত্রীদের টুঁটি টিপে ধরবে ব'লে তৈরি হয়েই আছে। কিন্তু বিদায় বন্ধু! এ যাত্রা আর তোমাদের সুবিধে হলো না। তোমাদের এলাকা পেরিয়ে এসেছি। এক পা দু পা তিন পা—ওঁরা নামছেন তো নামছেনই।

এক এক পা নামা মানেই জীবনের দিকে, লোকালয়ের দিকে, পরিবারের দিকে, স্নেহ মমতা প্রেম ভালবাসার দিকে এগ্নো। ওঁরা দক্ষিণ চ্ড়ায় পৌঁছে গেলেন। অক্সিজেনের বোতল দ্টো নিয়ে আবার শ্র্ করলেন নামা। চকিতে একবার তেনজিং-এর মনে পড়ল ল্যাম্বেয়ারের কথা। তেনজিং ল্যাম্বেয়ারকে কিছ্তেই ভুলতে পারেন না, এত বড় বন্ধ্ তাঁর আর কে আছে? যে ব্ট জোড়া প'রে আছেন তা ল্যাম্বেয়ারের দেওয়া। যে লাল স্কার্ফটা তাঁর গলায় সেটা ঠিক এক বছর আগে, (২৮শে মে, ১৯৫২), দক্ষিণ চ্ড়াটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ল্যাম্বেয়ার তাঁকে দিয়েছিলেন।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত দেহ দ্টোকে টানতে টানতে বেলা দ্টোর সময় তাঁরা দ্জন নবম শিবিরে পেঁছিলেন। এর মধ্যেই তাঁব্টার কি অবস্থা হয়েছে! বরফে প্রায় ঢেকে গেছে। বাতাসের ঘায়ে কয়েকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। উড়ছে পত পত ক'রে। যাকগে, এখন আর ওসব দেখবার সামর্থ্য নেই। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আজই দক্ষিণ 'কল্'-এর শিবিরে পেঁছিতে হবে। সেখানে লোয়ে আছেন উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায়। নয়েস আছেন। আর আছে আশ্রয়, অভয় সাহায্য।

তেনজিং স্টোভ জেবলে লেব্জল তৈরি করলেন। তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে এক একজন আকণ্ঠ পান করলেন। হিলারী অক্সিজেন বদল ক'রে নিলেন। তারপর সেই শিবিরে যে সব জিনিস-পত্র ছিল—ঘ্মবার ব্যাগ, বাতাস ভরা তোষক—সে সব ধীরে ধীরে গ্টিয়ে নিলেন। তারপর বোঝা পিঠে নিয়ে টলতে টলতে আবার নামতে শ্র্ করলেন।

স্ইসদের শিবির ছাড়াতেই পড়লেন প্রবল বাতাসের ঝাপ্টার মধ্যে। এক একটা ঝাপ্টা আসে আর ওঁদেরকে যেন পিষে ফেলবার চেষ্টা করে। বিপদের উপর বিপদ, যে পথটা ওঁরা বানিয়ে রেখে

গিয়েছিলেন, বাতাসের ঝাপ্‌টায় আর বরফের গুঁড়োয় তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। ওঁদের আবার পথ কাটতে হবে। প্রথমে হিলারী পথ কাটতে শুরু করলেন। ২০০ ফুট এগুবার পর তাঁর দম ফুরিয়ে গেল। তখন তেনজিং শুরু করলেন। ১০০ ফুট এগুবার পর নরম তুষারের বিস্তীর্ণ এক তরঙ্গভূমি পড়ল। অতি সাবধানে তাঁরা সেটা পার হলেন।

অষ্টম শিবির থেকে নয়েসই প্রথম ওঁদের দেখতে পেলেন। তিনি আর লোয়ে ওঁদের দুজনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রায় ৩০০ ফুট এগিয়ে গেলেন। তাঁরা গরম সুপ্‌ আর অক্সিজেন সঙ্গে এনেছিলেন। তেনজিং আর হিলারী এতই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন যে, তাঁদের কথা সরছিল না। ঢক ঢক ক'রে গরম সুপ্‌টুকু গলাধঃকরণ ক'রে ফেললেন। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন শিবিরের দিকে। তেনজিং শুধু ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধ'রে বোঝালেন, তাঁরা উঠতে পেরেছেন। নয়েস আর লোয়ের মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল।

বাইরে তখন তুষার-ঝড় আরম্ভ হয়েছে। তেনজিং আর হিলারী পিঠের বোঝা নামিয়ে তাঁবুর ভেতরে গেলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুমবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তুষার-ঝড়ের বেগ বেড়ে উঠল। প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তাঁবুর কাপড়ে ঝড়ের ধাক্কায় হিমালয় যেন হা হা হা হা ক'রে বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে দিল। তেনজিং আর হিলারী পরাজিত হিমালয়ের সেই হিংস্র, তীব্র আর্তনাদ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন পরম নিশ্চিন্তে। আশঙ্কার রাজত্ব, দুর্ভাবনার এলাকা তাঁরা পার হ'য়ে এসেছেন। আর ভয় কিসের? আজ বিশ্রাম। কাল যাত্রা। এখান থেকে থায়াংবক, থায়াংবক থেকে নামচেবাজার, নামচেবাজার থেকে বিজয়ীর মত, শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীর

গৌরব ব'য়ে নিয়ে কাঠমাণ্ডু। তারপর দিল্লী, কলকাতা, সারা পৃথিবী।

* * * * * *

* * *

সমস্ত পৃথিবী তেনজিং আর হিলারী আর কর্নেল হাণ্টের দলকে অভিনন্দিত করেছে, জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। আবার কার গৌরব বেশী, তেনজিং-এর না হিলারীর, কে আগে উঠেছেন, তেনজিং না হিলারী—তা নিয়ে ঝগড়া করেছে। সাহেবরা তেনজিংকে কোণ-ঠাসা করবার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতীয়েরা, নেপালীরা, এশিয়া-বাসীরা হিলারীকে স্বীকারই করতে চাননি। এই দুটো ব্যাপারেই তেনজিং খুব দুঃখ পেয়েছেন। কলকাতায় যখন এসেছিলেন, যখন বাইরে গিয়েছিলেন, তখন অনেকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখী তাঁকে হতে হয়েছে, এভারেস্টে কে আগে উঠেছে?

তেনজিং সমস্ত প্রশ্নের নিরসন করেছেন এক উত্তর দিয়ে; "আপনারা দড়িটাকে মনে রাখবেন। একদিকে বাঁধা ছিলেন হিলারী, অন্যদিকে বাঁধা ছিলাম আমি। ওই দড়িটাই হলো পৃথিবীর মানুষের দুর্দম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমি আর হিলারী দুটো বিচ্ছিন্ন সত্তা নই, সমগ্র মানবসত্তার দুটো অংশমাত্র। কে এভারেস্টে আগে উঠেছে? মানুষ। এ ছাড়া অন্য জবাব আর আমার নেই।"

শে র পা তে ন জিং

সামান্য একটা দড়ির বাঁধন প্রমাণ করল যে পূর্ব আর পশ্চিমের মিলিত প্রচেষ্টা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে একতার বন্ধন—তা অপরাজেয়কেও জয় করতে পারে।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষের একই সাধনা, দুর্জয়কে জয় করতে হবে। মানুষের একমাত্র পরিচয়—সে মানুষ। জাতি, বর্ণ, প্রাদেশিকতা সবই এ পরিচয়ের কাছে তুচ্ছ।

শুধু তেনজিং নোরকে নয়, সমগ্র শেরপা জাতিই তো একদিন ছিল তিব্বতের অধিবাসী। আজ তারা কেউ নেপালী, কেউ বা ভারতবাসী!

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত পার হ'য়ে আরো কিছুটা পশ্চিমে, মানচিত্রের ওপর রাষ্ট্রনীতির সীমানা টানলে যে পার্বত্য এলাকা পড়বে নেপালের পূর্ব সীমায়, তার নাম ষোলা খুম্বু। সুদূর অতীতে একদিন নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের সীমানা ছাড়িয়ে একদল তিব্বতবাসী চ'লে এসেছিল এই নেপাল সীমান্তের ষোলা খুম্বুতে।

ষোলা খুম্বু। যেদিকে চোখ যায় শুধু পাহাড়ের তরঙ্গ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই উঁচু নিচু হয়ে চলেছে পাথরের স্রোত। সাগর-তরঙ্গ যেন হঠাৎ কোন ঋষির অভিশাপে শিলার কাঠিন্য নিয়ে থেমে পড়েছে, অভিশপ্ত অহল্যার মত।

তিব্বত ছেড়ে নেপালে চ'লে আসার পর হাজার বছর কেটে গেল শেরপাদের জীবনে। যে গ্রামকে, যে মাটিকে উর্বর ভেবে আশার আলো দেখেছিল তারা, সে মাটি এতই কৃপণ যে মুখের অন্নটুকুও জুটল না শেরপাদের। তবু স্বপ্ন দেখল সেই

বৌদ্ধ শেরপার দল, এমন একজন কেউ জন্ম নেবে তাদেরই মধ্যে যে সমগ্র জাতিকে দারিদ্র্য আর অশিক্ষার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করবে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন তারা দেখা দিল থামী গ্রামের আকাশে। একটি শিশুর জন্ম হলো। তারপর আরো পাঁচজন শেরপার মতই দরিদ্র অশিক্ষিত একটি পরিবারে শৈশব কাটল সেই নবাগত সন্তানের। কখনও অপটু হাতে পিতামাতার পরিশ্রম লাঘব করার চেষ্টা করে ছেলেটি, কখনও সব ভুলে ঝর্ণার ধারে ব'সে তাকিয়ে থাকে দূরের স্বর্ণরঙা গিরিশিখরের দিকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিশাপ যখন বিশ্বজুড়ে নেমে এসেছিল তখন নেহাৎই শিশু ছিল সে। দারিদ্র্যের নিপীড়নে আর মনে অন্নের আকাঙ্ক্ষা পুষে যুবকের দল গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল সৈন্যের পোষাক প'রে। তারপর দিনে দিনে এসেছে তাদের মৃত্যু-সংবাদ, কেউ বা ফিরেছে পঙ্গু অপাহত শরীর নিয়ে। শোকের ছায়া আর বিষাদ কান্নায় ভ'রে গেছে থামী গ্রাম। তারপর যখন এসেছে শান্তির সুসংবাদ, মাত্র চার বছর বয়সের সেই শিশু সকলের মুখে দেখেছে আনন্দ নয়, বেদনা আর দারিদ্র্যের ছায়া।

যুদ্ধ ফেরত এক প্রতিবেশীর কাছে দিনের পর দিন সে শুনেছে, ওপারে পাহাড়ের তরঙ্গ পার হয়ে বহু ক্রোশ দূরে একটি স্বর্গরাজ্য আছে। সে রাজ্যের নাম দারজিলিঙ।

মাত্র ন' বছর বয়সে কৈশোরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে স্বপ্নশহর দারজিলিঙের হাতছানি দেখতে পেল সে। আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা, গ্রাম আর গ্রামবাসীর মায়া মুছে গেল মন থেকে। নিঃসম্বল হাতে একাকী পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলল সে। কিন্তু দারজিলিঙ শহরে পেঁছিতেই কে যেন তার সব আশা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

তখন বিদেশী ইংরেজ সরকারের প্রতিভূ বাংলার গভর্নরের

গ্রীষ্মকালীন বিলাসবাস ছিল এই দারজিলিঙ। এই উজ্জ্বল শহর, যেখানে টাকার ছড়াছড়ি, শখ আর শৌখিনতার ভিড়, অন্নলোভী শেরপাদের জন্য নয়। তাদের জন্য দারজিলিঙের নিম্নতম নোংরা বস্তি তুং সুং। শেরপা বস্তি তুং সুঙের অন্ধকার কুটীরে এসে উঠল ছেলেটি। জীবিকার জন্য আর আর শেরপাদের মতই কুলির কাজ করতে শুরু করল।

বছরের পর বছর গড়িয়ে চলে, আশাব্যর্থ কিশোরের চোখে যৌবনের রঙিন স্বপ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগে। এমনি ক'রেই কি দারিদ্র্যে আর অগৌরবে জীবন কাটবে? তুং সুং বস্তিকে সে ভালবাসে, জীর্ণ কাঠের দেয়ালে কি যেন মায়ার বন্ধন। কিন্তু বস্তির অজ্ঞানতা, পঙ্কিল আবহাওয়াকে তো সে ভালবাসে না। স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে, শিক্ষায় সচ্ছলতায় ভরিয়ে তুলতে চায় সে বস্তির প্রত্যেকটি মানুষকে। কিন্তু পথ কোথায়? পথ খুঁজে পায় না।

শহরের এক কোণে পাহাড়ের গা ঘেঁষে শেরপাদের পল্লী। একটা দেয়ালের কাঠের খরচা বাঁচাবার জন্য, না কি ঘরটা মজবুত হবে ব'লে বলা যায় না—ঘরগুলো সারবন্দী ভাবে সবই পাহাড়ে ঠেস দিয়ে আছে। বাকী তিন দিকে কাঠের দেয়াল, ছাদটাও। কিন্তু সে-সব ঘর যে কবে তৈরি হয়েছিল তার হদিস পাওয়া ভার। শিলাবৃষ্টি, ঝড়, পাহাড়ী বর্ষার ধারায় কাঠগুলো প'চে ক্ষ'য়ে গেছে। ছাদ ফুটো, দেয়ালের ফাটল দিয়ে শীতের রাতে হিমেল ঝড় ঢুকে পড়ে। কাঠ বদলাবার টাকা কোথায়! রাত্রে যে যেখান থেকে পারে, কেরোসিনের টিন, বিস্কুটের ডিবে, প্যাকিং বাক্সর কাঠ কিংবা পিচবোর্ড যোগাড় ক'রে পেরেক ঠুকে ঠুকে ফুটো বন্ধ করে। বাইরে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে এই ঘরে ফিরে আসতে হয় বিশ্রামের জন্য। অথচ এখানেও অবিশ্রাম জীবনযুদ্ধ। একমুঠো

ভাত, কিংবা রুটি। শরীর তাজা রাখবার জন্য এক ঘটি 'ছাঙ' অর্থাৎ নেপালী মদ। শেরপা পল্লীর সবাই যে কুলি তা অবশ্য নয়। দু'একজন কাজ করে দারজিলিঙ হিমালয়ান রেলে, কেউ পয়েণ্টস্‌-ম্যান, কেউ বা ওয়াগন চেকার। সিগন্যাল-পোস্টের শিখরে উঠে লাল নীল আলো জেবলে দেয়ার কাজ অনেকের। আর জনকয়েক আছে যারা এক একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলাসী বাবুরা এবং সাহেবরা দারজিলিঙ বেড়াতে এসে ঘোড়ায় চড়তে চায়। টাট্টু ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে শেরপারা। যৌবনের প্রথম ধাপে যখন পা দিল সেই যোলা খুম্বু থেকে পালিয়ে আসা ছেলেটি, তুং সুং বস্তির তখন এই দশা। সে নিজেও তখন কুলির কাজ করছে। তারপর একুশ বছর বয়সে সে শুনতে পেল প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্যে এক সাহেবের দল নাকি পাহাড়ে উঠবে। আর তাদের মালপত্র ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য শেরপাদের নিয়ে যেতে চায় তারা। ভাল মজুরি পাবে বিনিময়ে।

তরুণ শেরপাটির মনে পড়ল অন্য শেরপা সাথীদের কাছে শুনেছিল সে এই অভিযাত্রীদের কথা। বাক্স ভরা প্রচুর খাবার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে তাঁবু ফেলতে ফেলতে নাকি এরা ওপরে ওঠে। এভারেস্ট—পৃথিবীর চূড়া বলে যা পৃথিবীর কাছে স্বীকৃত, সেখানে ওঠবার বাসনা এদের। তাদের কাছে এই শিখরের নাম চোমোলাংমা। চোমোলাংমা অর্থাৎ পবনদেবের মা। খোঁড়া সেই শেরপা বন্ধুটির কথা মনে পড়ল। গত অভিযানের বরফের ঝড়ে একটা পা গুঁড়িয়ে যায় তার; তাই সেটা কেটে বাদ দিতে হয়। একটা চোখও নষ্ট হয়ে যায় চিরতরে। তা সত্ত্বেও অভিযানের গল্প বলতে বলতে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল সে, কালো ফিতেয় বাঁধা ঘড়িটা দেখিয়ে সগর্বে বলেছিল, সর্দার সাহেব দিয়ে গেছে। দারজিলিঙ শহরে যারা

গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে আসত তাদের টাট্টু ঘোড়া ভাড়া দিয়ে জীবিকা অর্জন করত লোকটি আরো অনেক শেরপার মতই। তরুণ মন ব'লে উঠল, আমিও যাব। আমি উঠব ঐ হিমালয়ের আকাশচুম্বী চূড়ায়।

যে সাহেব কুলি রিক্রুট করছিলেন তিনি তার সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে আরো পঞ্চাশটা শেরপার মতই ভর্তি ক'রে নিলেন। মাথায় ঝুঁটি বাঁধা উলের ময়লা টুপি, গায়ে রঙ-বেরঙের একটা ছেঁড়া সোয়েটার, হাফপ্যান্টের খাকীতে সাদা তালি মারা, জুতোর হাফসোলে ঘোড়ার নালের মত লোহার কাঁটা। অন্য শেরপার সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই।

অভিযাত্রী দলের সঙ্গে তরুণ শেরপাটির সেই প্রথম যোগদান।

১৯৩৫ সাল। এরিক শিপটনের সঙ্গে কুলি হিসেবেই অভিযানে যোগ দিতে হলো তাঁকে। আর সেইবারেই, সিকিম পর্বতমালার পথ ধ'রে ২১০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে তিনি আবিষ্কার করলেন একটি মৃতদেহ, আর ডায়েরী। এই ঘটনাটির এমন এক প্রভাব পড়ল তেনজিং-এর জীবনে যে, এভারেস্টের কথা উঠলেই আজও তাঁর চোখের সামনে সেই বিশেষ দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। সবাই লোকটির নাম দিয়েছিল পাগলা সাহেব। ২১০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে এসে যখন অশ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তেনজিং, তখন হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল একটি ছোট্ট ছিন্নভিন্ন তাঁবুর দিকে। আগ্রহে উৎকণ্ঠায় ছুটে এসে তিনি দেখতে পেলেন তুষারশয্যায় প'ড়ে আছে একটি শবদেহ। আর কাছেই একটি ডায়েরি কুড়িয়ে পেলেন তেনজিং। জানতে পারলেন, এই অভিযাত্রীর নাম উইলসন। নিঃশব্দে, একাই তিনি এসেছিলেন এভারেস্টকে জয় করতে। ভগবানে বিশ্বাস—এইটুকুই ছিল তাঁর পথের সম্বল।' মনে শক্তির উত্তেজনা

বোধ করলেন তেনজিং। কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ না ক'রে, শিক্ষিত আরোহীদের সাহায্য না নিয়ে উইলসন যখন ২১০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছেন, তখন তেনজিংই বা পারবেন না কেন অসাধ্য সাধন করতে? তাই শিপটনের সঙ্গে ২৪০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে শেষ অবধি ফিরে আসতে হলেও তাঁর মন দমে গেল না।

এরপর হিমালয়ের অন্যান্য নানা শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন তিনি। ১৯৩৫ সালেই একটি সুইস দলের সঙ্গে গিয়েছেন কেদারনাথ, ১৯৩৮ সালে হিমালয়ের গভীরে ভ্রমণ করে এসেছেন জনৈক ইতালীয় অধ্যাপকের সঙ্গে। সেইবারেই লাসা থেকে 'খাঙ্গার' নামের কুকুরটি নিয়ে আসেন তিনি। এই কুকুরটি আজও তাঁর প্রিয় সঙ্গী। তারপর বন্দর পুঞ্চ, নাঙ্গা পর্বতে গিয়েছেন তিনি টাংলু ও গ্রসের সঙ্গে—যেখানে শেষোক্ত দু'জন আকস্মিক পদস্খলনের ফলে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হন।

চোখের সামনে বহু অভিযাত্রীর মৃত্যু দেখেছেন তেনজিং, তুষারাঘাতে কাউকে হাত কেটে ফেলতে হয়েছে, কেউ বা পঙ্গু হ'য়ে গেছে সারা জীবনের জন্যে। তা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌঁছনোর উৎসাহ দমে নি তাঁর, অবিচলিত আস্থা নিজের শক্তির ওপর।

তারপরও অভিযানের পর অভিযান ব্যর্থ হলো। কিন্তু সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী—যে দেশ থেকেই এভারেস্ট জয়ের প্রচেষ্টা হোক না কেন, তেনজিংকে বাদ দিয়ে দল যেন সম্পূর্ণ হতে পারে না। এভারেস্ট পৌঁছনোর পথঘাট এত ভালভাবে আর কারই বা জানা আছে? এমন সুদক্ষ আরোহী এবং পথপ্রদর্শক খুঁজেও মিলবে না। কিন্তু তাঁর পিছনে নেই অর্থবল, তা ছাড়া তিনি ভারতীয়, তাই বিদেশী দল তাঁর কৃতিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও তাঁকে সম্মান দিতে রাজী নয়।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অর্থবল থাকলে তিনি নিজেই একটি

ভারতীয় দল তৈরি ক'রে যাত্রা করতেন, কিন্তু অর্থাভাবে এতকাল তাঁকে কুঁলি হিসেবেই যোগ দিতে হয়েছে বিদেশী দলে। ১৯৩৮ সালে টিলম্যানই প্রথম তেনজিংকে অভিযানের সদস্য হিসেবে গণ্য করলেন। আর এই বারেই ২৬০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হলেন তেনজিং।

গত যুদ্ধের সময় যখন অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল সে সময় তেনজিং সৈনিকদের পর্বতারোহণের শিক্ষা দিতেন এবং বরফের ওপর 'স্কী' করাও শেখাতেন।

১৯৫২ সালে অভিযানের দল এল সুইজারল্যাণ্ড থেকে। রেমন্ড ল্যাম্বেয়ার এবং তেনজিং ২৪শে মে তারিখে ২৮,২১০ ফুট পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হলেন। তখনও অদম্য প্রেরণা তেনজিং-এর, চূড়ায় উঠবেন তিনি। ল্যাম্বেয়ার ক্লান্ত হলেও তেনজিং থামতে চান না। কিন্তু ল্যাম্বেয়ার দূরদর্শী, তেনজিং তাঁর কাছে আপন আত্মীয়ের মত। প্রীতির বন্ধনে তেনজিংকে ক্ষান্ত করলেন ল্যাম্বেয়ার। আরো একটা বছব অপেক্ষা করতে বললেন তিনি। অপেক্ষা করতে বললেন, যতদিন না হিমালয় বন্ধুর মত শান্ত আবহাওয়াব হাত বাড়িয়ে দেয়।

হিমালয়ান ক্লাব নামে অভিযাত্রীদের যে বিখ্যাত সম্মিলনী আছে সে ক্লাবের সদস্য ছিলেন তেনজিং, ১৯৫২ সালে বিশ্ববিখ্যাত আলপাইন ক্লাবেরও সদস্য নির্বাচিত হলেন।

এই অভিযান বিফল হলেও সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত পৌঁছনোর দরুণ এবং তেনজিং-এর চরিত্রেব দৃঢ়তা জানতে পেবে সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ হলো। বিদেশে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখে মুখে তাঁর নাম শোনা গেল।

অথচ স্বদেশে কেউ কোন খোঁজ রাখল না। তাঁর কৃতিত্ব অজ্ঞাত হয়ে রইল সাধারণের কাছে। তিনি তখন তুং সুং বস্তিতে

দারিদ্রের মতই বসবাস করছেন। নিজে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাননি ব'লে অনুশোচনার অন্ত ছিল না তাঁর। নীমা ও পেমপেম দুই মেয়েকে তাই শিক্ষিত ক'রে তুলতে চাইলেন তিনি, অসচ্ছল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, শুধু নিজের কন্যাদের জন্যেই নয়, নেপালাগত আত্মীয়স্বজনদেরও সাহায্য করলেন, শিক্ষিত ক'রে তোলার চেষ্টা করলেন।

এই দিকটির পরিচয় না জানলে তেনজিং-এর চরিত্রের মহত্ত্বটুকু অজানা থেকে যাবে আমাদের কাছে। এভারেস্টের চূড়ায় পেঁছানো অনেক বড় কৃতিত্ব, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তেনজিং-এর হৃদয়ের কোমল দিকটি। আগেই যে কুকুরটির কথা বলেছি, একবার সেই কুকুরটির অসুখে সারারাত তার পাশে জেগে কাটিয়ে ছিলেন তিনি। নিজে তিনি এভারেস্টে আরোহণ করার স্বপ্ন দেখতেন যেমন, তেমনি সংসারের দিকেও ছিল তীক্ষ্ন দৃষ্টি। নিজে দরিদ্রের মত থাকলেও স্ত্রী ও কন্যা দুটির অভাব-অভিযোগ দূর করাও কর্তব্য ব'লে মনে করতেন। কিন্তু নিজের বা নিজের পরিবারের চিন্তাই নয়, তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল সমগ্র শেরপা জাতিকে কুলিমজুরের অবস্থা থেকে উন্নত করা, শিক্ষিত ক'রে তোলা। তাঁর আয় ছিল যদিও খুবই সামান্য, তবু সেই আয়েই তিনি বহু শেরপা ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যয় বহন করেছেন।

শুধু স্বজাতি নয়, স্বদেশের প্রতিও তাঁর হৃদয়ের টান কম নয়। তাই দার্জিলিঙ থেকে বিদায় নেবার সময় যখন এক বাঙালী বন্ধু তাঁকে একটি ভারতীয় পতাকা দান করেন তখন তেনজিং প্রতিজ্ঞা করেন যে, চূড়ায় পেঁছতে পারলে অন্যান্য পতাকার সংগে তিনি আমাদের জাতীয় পতাকাও তুলে ধরবেন। সমস্ত পথ পতাকাটি তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে তিনি সেটি এভারেস্ট শিখরে তুলে ধরেন। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে

তিনি যেমন জাতীয় পতাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি তাঁর মাতৃভূমি নেপালের প্রতি কর্তব্যও রক্ষা করেছেন। এভারেস্টের চূড়ায় উঠে তেনজিং তাঁর বরফ-কাটার কুঠারে বাঁধা ইউ এন ও, ভারতবর্ষ, নেপাল এবং ব্রিটেনের পতাকা তুলে ধরেছেন—এ ছবি আজ সমগ্র পৃথিবীর কাছে পরিচিত।

কিন্তু সেবার হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন তিনি। অর্থের সাচ্ছল্য নেই যে চিকিৎসা করাবেন দারজিলিঙে থেকে। বহু চেষ্টায় পাটনার হাসপাতালে একটি 'বেড' পেলেন তিনি। রোগশয্যায় প'ড়ে থাকতে হলো তাঁকে। তারপর আরোগ্যলাভ ক'রে একদিন একটি থার্ড ক্লাশ কামরার ভিড়ে ঠাসাঠাসি ক'রে ফিরে এলেন দারজিলিঙ শহরে। কেউ চিনল না, জানল না, সম্মান ও সহানুভূতি দেখাবার জন্যে এগিয়ে এল না কেউ। অথচ তখনও ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে শ্বেতকায় অভিযাত্রীদের ছবি ছাপা হচ্ছে, বিদেশে বহু ধনী অর্থ সাহায্য পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন দলকে; তুমুল আলোড়ন বইছে ইওরোপে, 'তেনজিং' নামটিকে ঘিরে।

১৯৫৩ সালের ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যাত্রা করলেন তিনি আবার। তিনি না থাকলে এভারেস্ট জয় অসম্ভব, জানতেন ব্রিটিশ দল, তাই মাসিক ৩০০ টাকা দক্ষিণা দেবার বিনিময়ে তেনজিং-এর সাহায্য ভিক্ষা করল অভিযাত্রী দল। কিন্তু তেনজিং দুঃখিত হলেন তাঁকে ব্রিটিশ অ্যালপাইন ক্লাবের সদস্য না করায়। সুইস দল কিন্তু গত বছরে এ সম্মান থেকে বঞ্চিত করেনি। এভাবেস্টে ওঠাব জন্য তেনজিং এতই উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন যে অভিযাত্রী দলের কোন কোন দুর্ব্যবহারও তিনি উপেক্ষা করলেন। ২৯শে মে ১৯৫৩ তারিখে এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম পদক্ষেপ ঘটল তেনজিং-এর। তাঁর সঙ্গে একই দড়িতে বাঁধা ছিলেন নিউজীল্যাণ্ডের হিলারী। তেনজিং বললেন, "আমরা দুজনই একসঙ্গে এভারেস্ট

চূড়ায় উঠেছি।” প্রচারবিদ্ ইংরেজী পত্রপত্রিকার উপেক্ষা সত্ত্বেও বিচলিত হলেন না তেনজিং। তিনি জানেন সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না। তাই তিনি চক্রান্তকেও ক্ষমা করলেন। ইওরোপের শ্রদ্ধা ঝরে পড়লো তাঁর উদ্দেশে, ব্রিটেনের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাল। লণ্ডনের বিমান বন্দরে নামতেই লক্ষ লক্ষ ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ শুধুমাত্র তাঁকে দেখবার জন্য ভিড় করে এলেন। সম্মান প্রদর্শনে এবং সহৃদয় ব্যবহারে তাঁকে অভিভূত করে ফেললো জনতা। যাঁরা তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরও বন্ধু বলে স্বীকার করলেন তেনজিং। হিলারীকে নিজের ভাই ব'লে সম্মান দিলেন। এ মহানুভবতা, এ মহত্ত্ব একমাত্র প্রাচ্যের মানুষের মধ্যেই সম্ভব, মন্তব্য করলেন বহু বিদেশী।

তিব্বতী ভাষায় 'তেনজিং' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। সত্যই তিনি জ্ঞানী, জীবনের সবচেয়ে বড় জ্ঞান—ক্ষুদ্রতা নীচতাকে জয় করা, ঈর্ষা এবং অহঙ্কারকে জয় করা— সে জ্ঞান তাঁর চরিত্রে স্বতোৎসারিত ভাবে দেখা দিয়েছে। জ্ঞানী তিনি সত্যই—অভিজ্ঞতায়, দূরদৃষ্টিতে আর চরিত্রবলে। ১৯৫২ সালের অভিযান যে সফল হলো তা তো শুধু একজনের চেষ্টায় নয়। সমগ্র দলটির ঐক্যবন্ধ প্রতিজ্ঞাই এ সাফল্য এনেছে—আর সেদিক থেকে তেনজিং-এর কৃতিত্বই সব চেয়ে বেশী। প্রথমত শেরপাদের দলটি সঙ্গে না থাকলে অভিযান সফল হতে পারতো না। ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের কাছ থেকে যথাযোগ্য ব্যবহার না পাওয়ায় শেরপারা কয়েকবার ফিরে আসতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, শুধুমাত্র তেনজিং-এর সদ্ভাব ও আন্তরিকতাই তাদের শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখিয়েছিল। দূরদৃষ্টিও কম নয় তাঁর। তুষারখাদ অতিক্রম করার দুরূহতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তিনি কয়েকটি মোটা মোটা গুঁড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে অভিযাত্রী দলকে বাধ্য করেছিলেন। এগুলি সঙ্গে না নিয়ে

গেলে অভিযান যে ব্যর্থ হ'ত তা প্রমাণিত হয়েছে। "দশ থেকে পনেরো ফুট লম্বা এই কাঠের গুঁড়িগুলির প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের সঙ্গে তো অ্যালুমিনিয়মের পুল রয়েছে"—প্রথমে এমন যুক্তি দেখিয়েছিলেন হিলারী।

তেনজিং সমগ্র দেশের জন্য এই সম্মান অর্জন করেছেন। দেশবাসীও তাদের ঋণ শোধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। যে দুর্জয় অভিযাত্রীকে এতকাল তারা সম্মান দেখাতে ভুলে গিয়েছিল তাঁর বসবাসের যোগ্য একটি বাড়ি তৈরি ক'রে দেবার ভার নিলেন দেশের জনসাধারণ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে সম্মানিত করলেন বিশেষ উপলক্ষ্যে তৈরি একটি স্বর্ণপদক দান ক'রে, নেপাল সরকার তাঁকে 'নেপাল তারা' উপাধি দান করলেন। ব্যক্তিগতভাবে দেশবিদেশে অনেকেই অনেক কিছু উপহার দিলেন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ঘড়ি, রেডিও প্রভৃতি যে-সব সামগ্রী উপহার দিলেন তার পরিমাণ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। ফ্রান্স ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ তাঁকে আল্প্‌স্‌ পর্বতের কোন কোন প্রদেশের 'সম্মানিত নাগরিক' হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ তো তাঁর জীবনের আদর্শ নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি পর্বতারোহী শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন তিনি, স্বপ্ন দেখলেন শেরপা জাতিকে কুলিমজুরের দারিদ্র্য আর দুরবস্থা থেকে সচ্ছল গৌরবময় ব্যক্তিত্বে উন্নীত করবেন। দেশে বিদেশে যে অর্থ পেলেন তিনি সম্মান দক্ষিণা হিসেবে, তা তিনি ব্যয় করলেন শেরপাদের শিক্ষার জন্যে। আর তুং সুং বস্তিকে ভুলতে পারলেন না, যে বস্তিতে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। দেশবাসী তাঁকে যে বাড়ি উপহার দিতে চাইল সে বাড়ি তুং সুং বস্তিতেই যেন হয়, প্রার্থনা জানালেন তিনি। নিজের উন্নতি নয়, সমগ্র বস্তির উন্নতি চান তিনি, সমগ্র জাতির।